দুইটার কোন একটাকে বাদ দিলে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

৯। বাল্যকালে পত্তনভূমি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

সংস্কৃত শিক্ষাকে ছাত্রদিগের পক্ষে একটা গুরুভার বোঝা মনে করিবার কোনই সঙ্গত কারণ দেখি না। আমি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী অবধি ছাত্র ছিলাম। যেরূপ ধাপে ধাপে আমাদিগকে ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতির সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজী শিক্ষা যতটুকু গুরুভার বোঝা মনে হইত, সংস্কৃত শিক্ষা তদপেক্ষা বড় বেশী গুরুভার মনে হইত না।

আমার পরলোকগত পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁহাকে পরম শ্রদ্ধাভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিতেন The Educationist of the day—তাঁহার এই মত ছিল যে, বাল্যকালে যে বিদ্যা শিক্ষা করা যাইবে, তাহা সহজেই আয়ত্ত হইবে এবং সেই কারণে বাল্যকালেই যথাসম্ভব বিভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা দিয়া পত্তনভূমি গড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মতের অনুসরণে তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে রোগে শয্যাগত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একদিকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন-বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদান করিতেন, এবং অপরদিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার অতিরিক্ত ফরাসী ল্যাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষা দিতেন। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদানের ফল মন্দ তো হয়ই নাই, বরঞ্চ সর্ব্বাংশে ভালই হইয়াছে।

১০। অকারণ ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

সংস্কৃত শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান বাধা বোধ হয় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ন্যায় দুর্বোধ্য ব্যাকরণ পড়িতে হইবে, এইরূপ কল্পনা। এরূপ কল্পনার কোনই কারণ নাই। যতদূর জানি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ব্যতীত অন্য কোথাও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বা পাণিনি ব্যাকরণ বা তদনুরূপ অন্য কোন ব্যাকরণ পড়ান হয় না ;—সর্ব্বত্রই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ব্যাকরণ-কৌমুদী" বা তদনুরূপ কোন ব্যাকরণ পড়ান হয়। ঐরূপ ব্যাকরণ নিম্নশ্রেণী অবধি প্রবেশিকার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া ধাপে ধাপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে সংস্কৃত ভাষায় যে বেশ একটু ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। যতদূর বুঝিতে পারি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হইতেই ব্যাকরণ-বিভীষিকা জন্মলাভ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও শিক্ষার্থীদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। কিন্তু এরূপ বিভীষিকার কোন কারণ দেখা যায় না।

১১। সংস্কৃত পরিত্যাজ্য ভাবিবার কারণ নাই।

সংস্কৃত শিক্ষাকে ছাত্রদিগের পক্ষে গুরুতর ভার, সুতরাং পরিত্যাজ্য মনে করিলে সেই একই যুক্তিবলে প্রবেশিকার পরবর্ত্তী পরীক্ষাসমূহের জন্য বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক যে সকল কঠিন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই সকলও বর্জ্জনীয় বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে কোন বিষয় বা পুস্তক সামান্য কঠিন বা দুর্ব্বোধ্য হইলেই পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ নীতি শিক্ষার মূলোচ্ছেদক সুতরাং গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ পুস্তকাদির সাহায্যে ছাত্রগণ যে নিজ নিজ অভীষ্ট শিক্ষাবিষয়ে ভাল পত্তনভূমি লাভ করে, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা বলিতেই হইবে যে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগকে অর্থসাধক বিজ্ঞান এবং আত্মোন্নতি-সাধক সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পত্তনভূমি প্রস্তুত করা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তদধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তব্য।

১২। সংস্কৃতশিক্ষা পরিত্যক্ত হইলে পরিণাম কি ?

(ক) বিদেশের নিকট জ্ঞানশিক্ষার ঝুলি ধারণ।

স্বেচ্ছাপাঠ্য নির্দ্দেশ করিবার ফলে সংস্কৃত শিক্ষা এদেশ হইতে যে অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা তাহা আমরা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সংস্কৃত শিক্ষা অন্তর্হিত হইলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর থাকিবে কি না সন্দেহ। যে কয়েকজন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন ও অনুসন্ধিৎসু হইবেন, তাঁহাদের অধিকাংশ প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য বিদেশীয় অনুবাদকদিগের নিকট ভিক্ষার ঝুলি উপস্থিত করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাঁহাদের বিতরিত জ্ঞানকণা ভ্রান্ত হইলেও অভ্রান্ত বেদবাক্যরূপে গৃহীত হইবার সমধিক সম্ভাবনা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

(খ) ধর্ম্মবিলোপের সম্ভাবনা।

সংস্কৃতশিক্ষা অন্তর্হিত হইলে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সকলও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানই বলিতে গেলে সংস্কৃত-লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের উপর দণ্ডায়মান এবং মন্ত্রাদির উপর সংগ্রথিত। ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত বিলুপ্ত হইলে ভারতের অবস্থা যে কিরূপ ভীষণ হইবে, তাহা কল্পনাতেও আনা দুরূহ। এখনও ভারতবাসীর উদ্দাম প্রবৃত্তিকে যেটুকু সংযমের বশে আনিতে পারা যাইতেছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ পিতৃপিতামহ হইতে আগত ধর্ম্মসাধনার অভ্যাস। এই ধর্ম্মভাবের লাগাম ছাড়িয়া দাও—কে ভারতবাসীকে বিনাশের কোন দিকে টানিয়া লইয়া চলিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

(গ) ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন বাঙ্গালা বুঝিতে গেলে সংস্কৃত জানা চাই। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার সহিত ফরাসীস বা নব্য যুগের অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষার যে সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার তদপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে কোন ভাষাতত্ত্ববিদ ইহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কেবল বাঙ্গালা বলি কেন, আর্য্যাবর্ত্তের ও মহারাষ্ট্র দেশের ভাষাসমূহ সম্বন্ধেও বোধ হয় এই কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষাকে বিদেশীয় ভাষার সহিত এক ও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া উহার অবশ্য-পাঠ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, অন্তত ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষাকে বিদেশীয় ভাষার সহিত এক ও অভিন্ন আসন প্রদান করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। এই কারণে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে classical ভাষাসমূহের সংরক্ষণ বা নির্ব্বাসনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতের বিদ্যালয়সমূহের classical ভাষাসমূহের সংরক্ষণ বা বির্ব্বাসন বিচার করিলে চলিবে না। একটু মনোনিবেশসহকারে আলোচনা করিলেই বোঝা যাইবে যে, ভাষায় সর্ব্বথা প্রকাশ করিতে না পারিলেও, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড ও ভারতের মধ্যে প্রভেদ গুরুতর।

(ঘ) সংস্কৃত শিক্ষা জনসাধারণ্যে শিক্ষাবিস্তারে অনুকূল।

কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃত শিক্ষা জনসাধারণ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রতিকূল। আমাদের নিকট এ মত সমীচীন বোধ হয় না। উহার বিপরীতে সংস্কৃত শিক্ষার পত্তনভূমি সংগঠিত হইলে তাহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ আনুকূল্যই করিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

১৩। অবশ্য পাঠ্যতার পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন sentimentality নহে।

বর্ত্তমান কালে কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত শিক্ষার স্বেচ্ছাপাঠ্যতার প্রতিবাদকে নিরর্থক sentimentality বা ভাবপ্রবণতার ফল মনে করেন। তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সংস্কৃত শিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য করিবার বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদকেও sentimentalityর ফল বলিয়া ধরিব না কেন? যাই হৌক, তাঁহাদিগকে আমরা ধীরভাবে বলিতে চাই যে, তাঁহাদের স্বেচ্ছাপাঠ্য করিবার স্বপক্ষে উক্তি যেমন আমরা sentimentalityর ফল মনে করি না, সেইরূপ তাঁহারা যেন অবশ্য পাঠ্য করিবার স্বপক্ষে আমাদেরও উক্তি sentimentalityর ফল না মনে করেন। আর যদি বা তাহাই হয়, তাহাতেও আমাদের লজ্জা বা ক্ষোভের কোনই কারণ দেখি না। ইহা জানা কথা যে, অনেক-ক্ষেত্রে sentiment জগতের গতিবিধি পরিচালিত করে—sentiment rules the world. যে ভাষার সহিত আমাদের জীবনের অনেক বিভাগ অস্থিমজ্জায় বিজড়িত হইয়া আছে, তাহার নির্ব্বাসন-দণ্ডের সম্ভাবনা আসিলে আমাদের প্রাণ যে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই ভাষা রক্ষাকল্পে যদি আমরা বদ্ধপরিকর না হই, তবে তাহাতেও আমাদের অত্যন্ত মূর্খতারই পরিচয় প্রকাশ পাইবে।

১৪। অনুবাদ প্রভৃতি পাইলেও অনেকক্ষেত্রে মূলভাষার সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক।

এ বিষয়ে অবশ্যই স্বীকার করিতে আমরা কোন দ্বিধা করি না যে ইংরাজী ভাষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেও এমন অনেক বিষয় ও গ্রন্থ আছে যেগুলি আধুনিক বঙ্গভাষা প্রভৃতি দেশপ্রচলিত ভাষার মধ্য দিয়া অনুবাদ প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পিতৃদেব যে আমাদিগকে আট বৎসর বয়সের সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সে সময় অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা ডাঃ কানাইলাল দের রসায়ন বিজ্ঞান এবং এক সুচিকিৎসক লিখিত অস্থিবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা জানি যে

এখনও অনেক সুলেখকের লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ইহাও আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক কালের এমন বিশেষ বিশেষ বিষয় বা গ্রন্থাদি থাকিতে দেখা যায়, সেগুলির প্রকৃত মর্ম্ম অনুবাদ প্রভৃতির সাহায্যে কিছুতেই হৃদ্‌গত হইতে পারে না—তাহা বুঝিতে গেলে মূল ভাষায় সেই সেই বিষয় বা গ্রন্থ আলোচনা করিতে হয়।

১৫। অনুবাদসমিতির প্রয়োজন।

দেশপ্রচলিত ভাষার মধ্য দিয়া যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গেলেও একটি অনুবাদসমিতি বা Translation Bureau স্থাপন করা আবশ্যক এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদিগকে সেই সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বোধ হয় জানা আছে যে, জর্ম্মণীর Frederick the Great এর উৎসাহে বিভিন্ন দেশের সদ্‌গ্রন্থরাজি অনুবাদিত হইয়া জার্ম্মান্ ভাষায় প্রকাশিত হওয়া অবধি জার্ম্মণী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ফ্রান্সের নিকট অধীনতা ও ঋণগ্রহণ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তদবধি জার্ম্মাণ ভাষা যে অপূর্ব্ব সমৃদ্ধিসম্পদের পথে কিরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রতাপবান জাপানও জার্ম্মণীর এই নীতি অনুসরণ করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে অল্পদিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং সাহিত্যাদি বিষয়ে স্বদেশকে স্বাধীনতা-মণ্ডিত করিতে পারিয়াছে। জার্ম্মণী এবং জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়াই উহাদের পক্ষে এরূপ অসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়াছে। আমরা পরাধীন জাতি হইলেও সাহিত্যাদি বিষয়ে প্রসার ও মুক্তিলাভের ইচ্ছুক হইলে এইরূপ একটি অনুবাদসমিতি স্থাপন করা বোধ হয় একান্ত আবশ্যক।

উপসংহার।

আমরা যথাসম্ভব সকল দিক হইতে দেখিয়া আসিলাম যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা নিতান্তই ভ্রান্তবুদ্ধির কার্য্য হইবে। কি ধর্ম্ম, কি সমাজনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি সকল দিক হইতেই আমরা দেখি যে, বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাকেও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর জন্য অবশ্যপাঠ্যভুক্ত না করিলে দেশের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইবে। এই সঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে, টোল প্রভৃতি, যেখানে ব্যাকরণ শিক্ষার জন্যই ব্যাকরণ অধীত হয়, সেই সকল স্থান ব্যতীত কোন বিদ্যালয়ে—এমন কি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলেও হৃদয়বিদারক মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ন্যায় গ্রন্থকে অবশ্যপাঠ্য রাখিয়া ছাত্রগণকে যেন বিভীষিকাগ্রস্ত করা না হয়।

প্রার্থনা।

(শ্রীসুহৃৎনাথ চট্টোপাধ্যায়)

বুঝিনা জানিনা নাথ,
এ তোমার কেমন ধারা,
অসম্ভব সম্ভবে জীবনপটে,
হয়ে যাই জ্ঞানহারা।
মোর সাধ্য নাই—
জানিনা কোথা হতে পাই,
উঠে ভাবরাশি চিত্তগগনে
উদাস মন মোর,
ঝরায় আঁখি লোর—,
তোমারে দেখি নাই,
তোমার কথা শুনি কানে,
তাই দিবানিশি,
নির্জ্জনে একা বসি,
মহা কুতূহল জাগে মম প্রাণে,
কেমনে মোর চিত্ত ভরে উঠে,
এক অজানা গানে।
ধন্য আমি, ধন্য মোর প্রাণ,
কে যেন আমারে,
লয়ে যায় পারে,
যেথা, মোর চিত্ত করে তাঁরে ধ্যান।
ঐ গিরি-প্রস্রবণে
নদী উপবনে,
তিনি বিরাজমান।
যেথায় মানুষ ঐ সঙ্কীর্ণতার মূর্ত্তিগড়ে,
গণ্ডীর মাঝে তারে ঘেরে,
সেথায় মানুষ করে, তারে অপমান,
তিনি শুধু লভেন সেই স্থান,
যেখানে মানুষ, মুক্তির মাঝে
তাহার সকল কাজে,
করিতে চায় তাহার সন্ধান।
পারে না, বহিতে, এ হেন দাসত্বপনা,
এমন করে,
মোর স্বাধীন চিত্ত,
দেহের বন্ধন মাঝে,
যেন হাঁপায়ে মরে,
হে নাথ, সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছ,
[illegible]রে,
পারনি ত করিতে বন্দী মনরূপ উদাস
[illegible]রে,

তাই মোর স্বাধীন চিত্ত,
তার আপন পক্ষ মেলে,
উড়িয়া যে চলে ;
মোর দেহ ত তারে,
ধরিয়া রাখিতে নারে,
কখন সমুদ্র গরজন,
জাগায় শিহরণ,
লয়ে যায় তারে অসীম পারাবারে,
যেথা, রাজে বনানীর শীতল ছায়া,
মোর মন লভে সেথা আপন কায়া ;
তাই বা দেব কেমন করে,
জুড়াই মনের বাসনা অপার
সংসারের শতেক শৃঙ্খল রাখে তারে
বদ্ধ করে।

পত্রিকা-পরিচয়।

সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা :— অগ্রহায়ণসংখ্যা ১৩৩৮ সাল। প্রাপ্তিস্থান ৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট।

প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী-লিখিত সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতগায়ক উজীর খাঁ সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :এই সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রবন্ধটী উপযুক্ত হস্তেই লিখিত হইয়াছে। উজীর খাঁর বংশতালিকা হইতে দেখা যায় যে, তিনি ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব ছিলেন ; পরে তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ আকবর বাদসাহের সময় তানসেনের সহিত যুক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কারণে উজীর খাঁর হৃদয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের হিন্দুভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বীরেন্দ্র বাবু আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি উজীর খাঁর জীবন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবেন। আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বীরেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধ "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আকবর সাহের দরবারে তিনি যে দীপক রাগ গাহিয়া ছিলেন এবং প্রকৃতির উপর তাহার কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছিল, বলিতে গেলে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে, রাগ-রাগিণী প্রকৃতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী সে বিষয়ে ইতি-পূর্ব্বে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, তানসেন-দীপকরাগসম্বন্ধীয় ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণাদি আছে। আমরা আগামীসংখ্যায় সেই সকল প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে ইচ্ছা করি। এই সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইলে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস বেহালা কিরূপে ধরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে তাহা এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিলাতের ন্যায় ভারতেরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বেহালা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি উপযুক্ত লোকের হস্তে পড়িলে বেহালা "কথা কইতে পারে"। তাই এই প্রবন্ধ কালের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে করি। নগেনবাবু এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ করিলে সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। বেহালা-শিক্ষাসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা বড়ই crued ভাবে লিখিত। নগেন বাবু বেহালা শব্দের পরিবর্ত্তে বাহুলীন শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। শব্দটী সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি আমরা বেহালা শব্দ ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। বেহালা-শব্দটী এত অধিক প্রচলিত যে, আমরা তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন শব্দব্যবহারের প্রয়োজন দেখি না। তবে "অধিকন্তু ন দোষায়" এই নীতি অনুসারে বাহুলীন শব্দটীও বজায় রাখিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ধানশীরাগ ও দশকুশী তালে একটি গীত দিয়াছেন। আমরা পদাবলীসংগ্রহে এইরূপ অপ্রচলিত রাগ ও তালের অনেক গান দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ সকল রাগ ও তাল অপ্রচলিত থাকিবার কারণে সেই সকল গান গাওয়া অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের ব্রজবাসী মহাশয়ের নিকট অনুরোধ এই যে, যে সকল পদাবলী বিভিন্ন রাগে ও তালে গাহিবার রীতি আছে, সেগুলি যেন স্বরলিপি সহ প্রকাশ করেন ; তবেই সেগুলির মিষ্টতা উপলব্ধ হইয়া বহুল প্রচারিত হইবে নিঃসন্দেহ।

এই সূত্রে আমরা প্রবেশিকার সম্পাদক মহাশয়কেও অনুরোধ করি যে, তিনি যেন তানসেন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা প্রভৃতি সকলজাতীয় সঙ্গীতই স্বরলিপি সহ একটু বেশীপরিমাণে প্রকাশ করেন এবং এই উপায়ে যেন উহাদিগের স্থায়িত্ব দান করেন।

"ঠুংরী" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্যাল ঠুংরী তাল সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। আমরা রসজ্ঞ সঙ্গীতপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই এই প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রকৃতই ঠুংরী খুব লঘু তাল হইলেও সুগায়ক

ওস্তাদদিগের দ্বারা ঐ তালসহকারে গীত গানগুলি শ্রোতৃবর্গকে যে কোন্ অরূপ রসসাগরে ডুবাইয়া দেয়, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ শুনিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে আমরা লেখকের সহিত একমত যে, ঠুংরী লঘুতাল হইলেও আদৌ উপেক্ষার বস্তু নহে।

এই সংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ ও গীতসূত্রকার লেখক ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গীতবেত্তা সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় স্বরলিপির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইউরোপীয় স্বরলিপি-জ্ঞানের অভাবে আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থলে ইউরোপীয় ভাল ভাল রচনা ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকের পক্ষে বাজান সম্ভব হয় না। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস, নীরেন বাবুর প্রকাশিত ইউরোপীয় স্বরলিপি-পদ্ধতি সেই অভাব দূর করিবে।

গ্রন্থপরিচয়।

কলিকাতায় চলাফেরা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। পৃষ্ঠা ১৩৮+৫০ মূল্য বারো আনা। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

পুস্তকখানিতে ঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় যান-বাহনের ক্রম-বিকাশের একটা চিত্র পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রাচীন কালের যানবাহন ও রাস্তার চিত্র এবং বর্ত্তমানের সমুন্নত বৈজ্ঞানিক যুগের যানবাহন ও রাস্তার ছবি পাশাপাশি দেখাইয়াছেন, যাহাতে পাঠক সহজেই তুলনায় সমালোচনা করিতে পারে, যাহাতে পাঠক সহজে উপলব্ধি করিতে পারে, কোনটি সুখের—প্রাচীন না আধুনিক অবস্থা।

তারপর তিনি দেখাইয়াছেন—কেমন করিয়া বিশ্ব-ব্যাপী উন্নতির ঢেউ আসিয়া মানবকে অচেতন অবস্থা হইতে সচেতন করিয়া তোলে, কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সকলকেই বিশ্বের সঙ্গে 'হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা' সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে,—নতুবা নিস্তার নাই, ধ্বংস অনিবার্য্য।

পুস্তকখানিতে আর একটি দেখিবার বিষয় এই যে, মানুষ কিছুতেই সহজে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নবীনতার উপাসক হইতে পারে না, কিন্তু পরিশেষে প্রয়োজনের ধাক্কা যখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়, তখনই মানব নবীনকে জীবনের মুক্তি-পথের অগ্রদূতরূপে বরণ করিয়া লয়।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিরূপে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির পথ খুলিয়া যায়, মাড়োয়ারীগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

নূতন ও পুরাতনের সংযোগ-সাধকরূপে আমরা এই গ্রন্থকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

সুবর্ণবণিক সমাচার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮।

ক্ষিতীন্দ্র বাবু প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তিনি এই পুস্তকে "সেকাল আর একালের" কলিকাতার অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। "সেকাল" বলিতে হয় ত অনেকের মনে হইবে প্রাচীন কালের কথা—অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্ব্বের বিবৃতি। তাহা নহে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারই আভাষ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা সরল। ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই পুস্তক করিয়া ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের গবেষণার পথ অনেকটা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এদেশের কথা—২০শে মাঘ, ১৩৩৭।

শোকসংবাদ।

ডাক্তার ৺প্রসন্নকুমার রায়—গত ৮ই মাঘ শুক্রবার খ্যাতনামা ডাঃ পি, কে, রায় তাঁহার হাজারিবাগের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৮২ বৎসর হইয়াছিল। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক বিদেশে গিয়া জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ডাঃ পি, কে, রায় তাঁহাদের অন্যতম। ইনি প্রধানত শিক্ষাদান কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম ভারতীয় "এডুকেশন্যাল সার্ব্বিসে" প্রবেশ-লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের পদেও ইনি একবার কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ইনি চিরদিন সমাজসংস্কার কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন। ইঁহার পত্নী ও কন্যাগণকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

GOVERNMENT OF BENGAL.

POLITICAL DEPARTMENT,

Political.

CIRCULAR.

No. 951 P.S.

Calcutta, the 27th January, 1932.

In a previous communique it has been explained that the publication of matter which assists the activities of the Working Committee of Congress, or other committees or associations which have been declared unlawful, is an offence under section 17 (1) of the Indian Criminal Law Amendment Act, 1908. It was also explained that action might be taken under the Emergency Powers Ordinance, 1932, under which Government has power to regulate the press to prevent the furtherance of the civil disobedience movement. It is now desirable to amplify the above explanations and to issue more detailed instructions for the guidance of all concerned.

2. Section 63 of the Emergency Powers Ordinance, 1932, applies the provisions of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931, to the printing and publication of objectionable matter of any of the kinds described in section 63 of the Ordinance. Security can therefore be demanded as provided in the Act, and will be liable to forfeiture on any repetition of the offence.

3. Section 4 (1) of the Emergency Powers Ordinance, 1932—powers under which have been conferred on District Magistrates and the Commissioner of Police, Calcutta—enables the local Government or any officer empowered under that section to take action against those, concerned in the production of any newspaper if the matter published appears to be in furtherance of a movement prejudicial to the public safety. It is within the power of the Government or the officer acting under this section to require the editor, publisher and printer to refrain from publishing objectionable matter. It is also within the power of Government or the officer acting under this section to require the above persons to publish, in such manner as may be directed, correct reports of political events and notices or advertisements which counteract incorrect reports or notices or advertisements which have the effect of furthering the civil disobedience movement. In serious cases, orders may be passed for the suspension of publication of an offending newspaper. Any disobedience of such an order is liable to a penalty not exceeding 2 years' imprisonment and a fine under section 21 of the Ordinance.

4. The following are instances of the class of matter the publication of which would be considered by Government to require action under one or more of the provisions of law quoted above :—

(1) Congress propaganda of any kind, including messages from persons arrested.

(2) Any messages issuing or purporting to issue from persons confined in jail.

(3) Any immoderate criticisms of Government or Government officials.

(4) Any exaggertated reports of political events. This includes the extravagant use of headlines and the setting up or the placing in juxtaposition of news items in such a manner as to further the civil disobedience movement by giving an exaggerated impression of excitement in the country.

(5) Any notices or advertisements of meetings, processions or other activities intended to promote civil disobedience.

(6) Any photographs of persons taking part in Congress activities or of any incidents relating to such activities.

5. The above illustrations are not exhaustive but are intended to give some guidance to those concerned as to the kind of matter which might expose them to penalties. At the same time Government wish it to be understood that they have no desire to interfere with honest journalism and have no wish to penalise occasional and unintional inclusion of undesirable matter in a paper which in ordinarily well-conducted.

By order of the Governor in Council,

Additional Deputy Secretary to the Government fo Bengal,

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৫। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে।

মা! রাত্রি যখন গভীর, আনন্দের কোলাহল হরষের হাসি যখন সম্পূর্ণ নীরব হইবে, তখনই তুমি আমাকে জাগাইয়া তুলিও। তখনই তোমাতে আমাতে প্রাণের গভীর কথা হইবে। তখনই আমি তোমার কাছে জ্ঞানশিক্ষা করিব; তখনই তুমি আমাকে স্নেহের শতচুম্বনে ভরিয়া দিবে, আর আমি তোমারই কাছে প্রেমের ভাষা শিক্ষা করিব। সেই গভীর রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিব, আর বুঝিব তুমি কেমন করিয়া এই বিশ্ব রচনা কর। এই রকম কোন এক রাত্রে তুমি আমাকেও সৃষ্টি করিয়াছিলে; তাই বুঝি, এই রকম রাত্রি আমার বড় ভাল লাগে। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলে বলিয়াই বুঝি রাত্রি এত সুন্দর হইয়াছে। নিশীথের এই নিঝুম নিস্তব্ধতির মধ্যে আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—সমস্ত নিঃশব্দ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কি জানি প্রাণের কি এক আকুল প্রার্থনা কাঁদিয়া উঠিয়া সমস্ত আকাশকে রণিত করিয়া তুলিতেছে। তারা হইতে তারায় তোমার যে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত, আমার প্রাণ দুই বাহু বাড়াইয়া সেই স্রোত ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিতেছে। তোমার নামেই আমার সমস্ত প্রাণ স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ঘুমের আবেশ আমার চক্ষে এতটুকু নাই—জাগরণের সোনার কাঠির স্পর্শে আমার প্রাণ তোমার চরণপূজায় নবতর অধিকার পাইয়াছে। আমাকে শিক্ষা দাও, শক্তি দাও, যাহাতে তোমার এই সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যরচনায় আমিও আমার অক্ষম হাতে সাহায্য করিতে পারি। তুমি তোমার বাঁশী বাজাইবে, আমি তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিব; আর তাহারই তালে তালে তোমার এই শোভনসুন্দর সৃষ্টি বিকশিত হইতে থাকিবে। তাহারই তালে তালে প্রাণসাগরে নব নব হিল্লোল উঠিবে। তাহারই তালে তালে আকাশ ও পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য এবং গ্রহতারকা সকলে মিলিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিবে এবং নব নব জগতের জন্ম দান করিবে। আমি—আমি নির্ব্বাক হইয়া তাহা দেখিব এবং তোমারই রূপসাগরে ডুবিয়া মরিব।

১০৬। সংশয় ও সমাধান।

মা! আমার প্রাণে কতই প্রশ্ন সাগরতরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে আর মিলাইয়া

যাইতেছে। আজ ঠিক করিয়াছি, তোমাকে সেই সকল প্রশ্নের কতকগুলি জিজ্ঞাসা করিব—উত্তর পাই বা না পাই, উত্তর যা পাইব, তাহাও বুঝি বা নাই বুঝি। এই সুনীল আকাশে তুমি নিস্তব্ধ নিশীথে এতগুলি প্রদীপ হীরকের তেলে জ্বালাইয়া রাখিয়া জাগিয়া বসিয়া থাক কেন? যাহারা জাগিয়া থাকে, তাহারা তোমার ঐ সমস্ত প্রদীপের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই দরকার মনে করে না। বাকী যাহারা ঘুমাইয়া থাকে, তাহাদের তো কথাই নাই। তোমার ঐ প্রদীপগুলি তো বৃথাই জ্বলে—কাহার জন্য? তুমি চারিদিকে ফুল ফুটাইয়া রাখ। দিনের ...য় তাহারা হাসির ছটায় দিকবিদিক আলোকিত করিয়া তুলে; সন্ধ্যাবেলায় তাহারা নববধূর ন্যায় সলজ্জবেশে আপনাদিগকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। দিনের বেলাতেই বা কে সেই হাসির সঙ্গে নিজের হাসি মিলাইতে যায়, আর সন্ধ্যাবেলাতেই বা কে সেই সলজ্জভাবের আরক্ত আভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে যায়? —তবে কেন, মা! এত ফুল ফুটাইয়া জাগিয়া বসিয়া থাক কেন? জীবের প্রাণে এত প্রেম উৎসারিত হয় কেন? তাহাদের উৎসই বা কোথায়? মানুষ এই প্রেমের জন্য এত পাগল কেন? প্রেমরস যতই পান করে, ততই তাহার জন্য পিপাসা আরও বাড়িয়াই যায়। প্রেমের সন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়াও যাহারা তাহা পায় না, তাহাদের হতাশ প্রাণের দিকে চাহিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাক কি প্রকারে? আমার সর্ব্বশেষ প্রশ্ন এই যে, আমার মত অধম সন্তানকে এই সংসারে পাঠাইয়া তোমার কি লাভ হইল? আমার পক্ষে ভালই হইয়াছে—আমি তোমার চরণপূজার অধিকার পাইয়াছি; কিন্তু তোমার তাহাতে কি লাভ? এই সংসারের সুখদুঃখের ঝড়ঝটিকা খাওয়াইয়াই বা তোমার কি লাভ হয়? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য এক একবার আমার প্রাণ বড়ই ছটফট করিতে থাকে। উত্তর দাও বা নাই দাও, তুমি একবার আমাকে তোমার ঐ কোলে তুলিয়া আদর কর। কে যেন আমার প্রাণে বলিয়া দিতেছে, তোমার একটুখানি আদর খাইলেই আমার সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে, সকল সংশয় দূর হইবে, হৃদয়ের গ্রন্থিই খুলিয়া যাইবে।

১০৭। চরণধূলি।

মা! তুমি যে পথ দিয়া চল, তাহার প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে বড়ই পবিত্র। ইচ্ছা হয়, প্রতি ধূলিকণা অঙ্গে মাখিয়া তোমারই চরণতলে পড়িয়া থাকি। সেই প্রতি ধূলিকণার স্পর্শে সমস্ত প্রাণটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। প্রতি ধূলিকণা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র সুগন্ধ পুষ্পের আকার ধারণ করে, আর আমার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধে ভরিয়া দেয়। তোমার যে স্নেহপ্রেম আমাদের অন্তরে ঢালিয়া দিয়াছ, তাহার প্রতি বিন্দু আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইয়া সমস্ত বিশ্বজগত ছাইয়া ফেলে এবং পরিণামে তোমারই চরণে গিয়া আশ্রয় পায়। জননী! তুমি ছাড়া আমার আর কোনই আশ্রয়স্থল নাই। একে একে সকলেই তো আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু তুমিই আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া তোমার মাতৃস্নেহে আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছ; বিপদ ও মৃত্যু আমা হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, কিন্তু তুমি পার্শ্বে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছ দেখিয়া ঝড়ের একটী ঢেউও আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এত কঠোর বর্ষা সমস্ত ভাসাইয়া দিল, কিন্তু এক বিন্দু জলও আমার গায়ে লাগিল না! তোমার জন্য আমার প্রাণে যে আগুন দিবানিশি জ্বলিতেছে, সেই আগুন বর্ষার জল আর ঝড়ের বাতাস সমস্তই শুকাইয়া উড়াইয়া দিতেছে। আমি তোমারই দীনদুঃখী সন্তান—আমার দুঃখদৈন্য দেখিয়া কেহই তো কাছে আসে না; একমাত্র তুমিই আমার এই আঁধার ঘরে আসিয়া সকলের অজানতই এই ঘর যে আলোকে আলোকে ভরিয়া দিয়াছ। যাহার কেহ নাই, তুমিই তাহার সহায়, তোমার স্নেহই তাহার সর্ব্বস্ব। তোমার চরণধূলিতে আমার এই অন্ধকার গৃহ পবিত্র হইয়াছে, দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।

ধর্ম্মধারা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। একই সত্যের বিভিন্ন নাম।

ভারতীয় আর্য্য ঋষিদিগের সত্যনিষ্ঠা আশ্চর্য্য—তাঁহারা সত্যের অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সত্যকে পরিস্ফুট আকারে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল সত্যের মূল ভগবানকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে সেই আদি সত্যেরই বিভিন্ন-মূর্ত্তিতে বিকাশরূপে অনুভব করিলেন এবং সেই সত্য ঘোষণা করিলেন—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—একই সত্যকে বিপ্রগণ নানা নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদিতে রত থাকিতেন সত্য, কিন্তু ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়াই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন।

২। ব্রহ্ম কেন্দ্রে।

জগতে সকল বিষয়েই একটা উত্থানপতনের ধারা বহে দেখা যায়। আর্য্যঋষিদের মধ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শাস্ত্রসকল একটু নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমরা যে সময় অবধি আর্য্য সভ্যতার আদিম অবস্থা বুঝিতে পারি, সেই বৈদিক কালের প্রথম সময় পর্য্যন্ত যাগযজ্ঞের বহু আড়ম্বর প্রচলিত ছিল। তাহার পর এক সময় আসিল, যখন যাগযজ্ঞের ঘনঘটা অন্তর্হিত না হইলেও এক প্রবল ঋষিসম্প্রদায় ঐরূপ যাগযজ্ঞের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিলেন এবং একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মনামের জয়গান করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বীজ প্রোথিত করিলেন। এইরূপে একবার যাগযজ্ঞ আর একবার ব্রহ্মনামের মহিমাপ্রচার, বহুকাল যাবৎ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ববিবাদ, উভয়ের মধ্যে উত্থানপতনের লীলা চলিতে লাগিল। কিন্তু সেই উত্থানপতনের লীলা মোটের উপর ব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়াই চলিয়াছিল।

৩। ভারতে আর্য্য উপনিবেশ।

ব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া ঐ সকল লীলা সংঘটিত হইবার কারণ এই যে, চতুর্ব্বেদ সংগৃহীত হইয়া যথাযথ-ভাবে বিভক্ত হইবার বহু পূর্ব্বাবধি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ এবং যে সকল ঋষিদের নাম আমরা শাস্ত্রে পাই, তাঁহাদেরও পূর্ব্বপুরুষ আদিমতম ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টিবলে প্রকৃতির অন্তর হইতে যে আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সন্ধান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সময়ের গুণে ও স্থানমাহাত্ম্যে সেই জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছিল মনে হয়। আর্য্য-জাতির আদিমতম বসতি যে ভারতের উত্তরাঞ্চলে কোন এক স্থানে ছিল, ইহা বলিতে গেলে একপ্রকার সর্ব্ববাদ-সম্মত। কালক্রমে তাঁহারা যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দলে জগতের বিভিন্ন অংশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এক বা একাধিক দল যে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও এক-প্রকার সর্ব্ববাদসম্মত বলিতে পারি। যাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কারণেই হৌক, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের ভাবধারা—তাঁহাদের সকল কর্ম্মকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিবার মূলভাবকে শুধু অব্যাহত রাখেন নাই, প্রত্যুত উহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক-পূর্ব্বযুগের ভাষাও ভারতে চলিয়া আসিয়া অন্যান্য দেশে বিক্ষিপ্ত দল অপেক্ষা ভারতে সমাগত আর্য্যদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

৪। যাগযজ্ঞ ও উপনিষৎ।

আর্য্য ঋষিরা ভারতে আসিবার পূর্ব্বে যে পার্ব্বত্য-দেশে বাস করিতেন, সেখানে তাঁহারা যে কি কষ্টে দিন যাপন করিতেন, তাহা অনুমেয় কিন্তু সম্পূর্ণ বর্ণনার অতীত। তাঁহারা যখন ভারতে নামিয়া আসিয়া সূর্য্য-কিরণে সমুজ্জ্বল, শস্যশ্যামল, ওষধি-বনস্পতিতে পরিপূর্ণ সুরধুনীবিধৌত ভূখণ্ড দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা যে কি সুখ লাভ করিলেন, কি সোয়াস্তি অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো কঠিন। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে এক আশ্চর্য্য ও সর্ব্বাংশে নূতনতর দৃশ্য—এক বিশাল বিরাট vista খুলিয়া গেল। তাঁহাদের সমস্ত হৃদয় ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তাঁহাদের মস্তক তাঁহার চরণে অবনত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের অন্তর হইতে কত শত নবনব গীত সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা ভগবানের নামে শতবিধ প্রকারে যাগযজ্ঞের ভিতর দিয়া দানধ্যানের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাই ক্রমে যখন বৃহদাকার ধারণ করিল, তখন ভগবান সেই সমস্ত যাগযজ্ঞের ভিতর অন্তর্নিগূঢ় কেন্দ্ররূপে অবস্থিতি করিলেও তাঁহার পূজার্চ্চনা প্রকৃতপক্ষে গৌণ হইয়া পড়িল, যাগযজ্ঞই মুখ্যস্থান অধিকার করিল। এখন তাহার অপরিহার্য্য ফলে নানা কদাচার অনা-চার সমাজে প্রবেশ করিল। সেই সকল অনাচার কদাচার সমাজের জ্ঞানীগুণী লোকদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ভাবধারা অনেক অংশে ফিরাইয়া আনি-লেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের সকল কর্ম্ম হৃদয়ে

যাগযজ্ঞকে বাদ দেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মকে মুখ্য আসন প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রকার সংঘর্ষের ফলেই সম্ভবত আমরা উপনিষৎসমূহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

৫। শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব।

বহুকাল যাবৎ এই প্রকার যাগযজ্ঞমূলক আচার-ব্যবহারের সহিত মুখ্যভাবে ব্রহ্মোপাসনার দ্বন্দ্ববিবাদ চলিয়াছিল। একবার যাগযজ্ঞের দিকে জনসাধারণ ঝুঁকিয়া পড়িল, একবার বা ধর্ম্মসংস্কারকের যুক্তিবলে যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জনসাধারণ ব্রহ্মোপাসনাকেই মুক্তির উপায় বুঝিয়া তাহাই অবলম্বন করিবার পথে ধাবিত হইল। তাই এদেশে শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে কত—কতবার সংগ্রাম চলিয়াছিল। ইহারই ফলে আমরা ভারতভূমিতে বহু ধর্ম্মসংস্কার হইতে দেখি, যাহার জন্য ইহা পুণ্যভূমি বলিয়া উক্ত হয়। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতের জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছিল যে, যাগযজ্ঞ বল আর যাহা কিছু বল, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কোন কিছুই দাঁড়াইতেই পারে না। ভারতের আর্য্যেরা স্থির করিয়া লইলেন যে, ব্রহ্মই সমস্ত প্রকৃতির মূল কারণ। এই বিষয়ই আরও গভীররূপে আলোচনা করিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে, প্রকৃতির যিনি মূল কারণ, তিনিই আমাদের আত্মারও আত্মা—আত্মাও সেই মূল কারণে অধিশ্রিত হইয়া আছে।

৬। ঔপনিষদ আখ্যায়িকা।

আর্য্যদিগের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে একটা সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। সেই আখ্যায়িকা বলে যে, কোন এক সময়ে (সম্ভবত কোন এক যুদ্ধে) দেবতাদিগের বিজয়লাভ হইল। বলা বাহুল্য যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই দেবপ্রসাদের ফলেই এই বিজয়লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে দেবতাদের হৃদয়ে অহঙ্কার আবির্ভূত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন না যে, তাঁহাদের বিজয়ের মূলে মঙ্গলবিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা—তাঁহাদের বিজয়ের কারণ দেবপ্রসাদ; তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদেরই বলবীর্য্যের প্রভাবে, নিজেদেরই অপ্রতিহত প্রতাপে এই বিজয়লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের এই অহঙ্কার জানিতে পারিয়া দেবতাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবতারা এই অলৌকিক মহাপুরুষকে ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে দেখেন নাই; কাজেই তাঁহারা কৌতূহল প্রকাশপূর্ব্বক পরস্পরের দিকে মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। তখন ঐ নবাগত দেবতার স্বরূপ জানিবার জন্য দেবতারা সকলে মিলিয়া অগ্নিকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। ব্রহ্ম শক্তিপরীক্ষায় অগ্নিকে পরাস্ত করিলেন। অগ্নি চলিয়া আসিলেন। শক্তিপরীক্ষায় বায়ুও পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন সকলে দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মের নিকট পাঠাইলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া "উমা হৈমবতী"কে দেখিয়া ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। উমা বলিলেন—ইনি ব্রহ্ম।

৭। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা পাই যে, ভারতের শস্যশ্যামল সমতলভূমিতে আসিবার বহু পূর্ব্বে বহু-দেবোপাসক ও ব্রহ্মোপাসক, আর্য্যদিগের মধ্যে এই দুই সম্প্রদায় সমুত্থিত হইয়াছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদও বড় অল্প হয় নাই। পরিশেষে ব্রহ্মোপাসনার পরিণামে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলেই ব্রহ্মোপাসনারই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবোপাসকগণ বুঝিলেন যে, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাই তাঁহাদের বিজয়লাভের মূলে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা বুঝিলেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল, জগতে যাহা কিছু আছে, সকলেরই অন্তরে ভগবান অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ভগবানই অগ্নিতে অগ্নি হইয়া, বায়ুতে বায়ু হইয়া এবং জলেতে স্নেহরূপে আছেন বলিয়াই প্রকৃতির যাহা কিছু সকলই যথানিয়মে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। "ব্রহ্মই সকল সত্তার মূলাধার, সকল শক্তির মূল প্রবর্ত্তক, সকল আত্মার পরমাত্মা"। ব্রহ্মের শরণাগত যিনিই হইবেন, তাঁহারই অন্তরে নিরাশা নিরানন্দ বিদূরিত হইয়া আশা ও আনন্দ, নবতর বলবীর্য্য ও তেজের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা বুঝিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা। এই ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্র হইল ওঁকার। এই ওঁকারকে প্রাণের ভিতর আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের জীবনের সকল বিভাগেই বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

৮। বৈদিক যুগের শেষে ব্রহ্মবিদ্যার প্রাধান্য।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আর্য্যেরা যখন ভারতভূমিতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে ঐ ওঙ্কারকেন্দ্রক ব্রহ্মবিদ্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া ভগবানের দানসকল অযাচিতভাবে পাইতে লাগিলেন। শস্যসম্ভারে ধনরত্নে তাঁহাদের গৃহসকল সহজেই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের অধিকাংশ আবার ক্রিয়াবহুল দেবোপাসনাতেই নিরত হইয়া পড়িলেন, বাহিরের আড়ম্বর ও কোলাহল কলরবে মাথানো যাগযজ্ঞাদিতে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত

যাগযজ্ঞ, সকল কর্ম্ম, সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে ব্রহ্মকে রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। ভারতে আসিবার পর যাগ-যজ্ঞের প্রভাব বড়ই বেশী হইয়া পড়িল। বৈদিক যুগের আদিমকালে ইহাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ বৈদিক যুগের শেষে ঋষিরা যাগযজ্ঞের মায়ামোহ ভেদ করিয়া আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে নবতরভাবে ধারণ করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া সমস্ত জগতের নমস্য হইলেন।

৯। অন্তর্ব্বিবাদ।

এই প্রকারে এই ভারতভূমিতেই ধর্ম্মবিষয়ক দ্বন্দ্ব-বিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ উপস্থিত হইল। একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপ্লব ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সকলেই অবগত আছেন যে, ভারতে আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যত-দূর দেখা যায়, তাহাতে দেখি যে, বৈশ্যগণ নির্ব্বিবাদ ছিলেন, নির্ব্বিরোধে ব্যবসাবাণিজ্যে রত থাকিয়া দেশের সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে এবং দেশ ও সমাজের মঙ্গলসাধনে আত্মনিয়োগ করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও রাষ্ট্র-নৈতিক, সর্ব্বপ্রকারের বিরোধবিবাদের অন্ত ছিল না। ব্রাহ্মণগণের নিজেদের মধ্যে বিবাদের জ্বলন্ত সাক্ষী বৈশম্পায়নের সঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বিবাদ, যাহার ফলে যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ, এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এই বিবাদের ফলে অবশ্য আমাদের লাভই হইয়াছে—বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমরা তাহার অতিরিক্ত অনেক নূতন বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিবাদের জ্বলন্ত সাক্ষী বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সংগ্রাম, যাহার ফলে world-peaceএর বা শান্তিমন্ত্রের বীজমন্ত্র—ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং—লাভ করিয়াছি; যাহার ফলে আমাদের গৌরবের মহান আকর গায়ত্রীমন্ত্র বিশ্বামিত্রের নিকট অমূল্য দানস্বরূপে লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদের ফলেই আমরা দেখি যে, পরশুরাম আর্য্য-অনার্য্য ভারতবাসী মাত্রকেই দেখাইলেন যে, প্রয়োজন হইলে নিম্নশ্রেণী হইতে এবং সম্ভবত অনার্য্য শূদ্রদিগের ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

১০। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ্য।

কেবল যে ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যে অথবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদমূলক বিপ্লবসমূহ ভারতের জন-সমাজকে আলোড়িত ও বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে, ক্ষত্রিয়দেরও পরস্পরের মধ্যে সময়ে সময়ে প্রচণ্ড দলাদলি প্রবল বিবাদ উপস্থিত হইত। সমগ্র রামায়ণ ও সমগ্র মহাভারত এবিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করে। রাম-রাবণের যুদ্ধ আর কিছুই নহে—রাবণের রাজ্যে ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত অনাচার ও কদাচার, কতকটা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিকৃত আচার-ব্যবহারের মতো, প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত আচারমূলক অসদ্ধর্ম্মের স্থানে আর্য্যসভ্যতার ফলস্বরূপ সদ্ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনই রামচন্দ্রের রাবণের বিরুদ্ধে অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও মূলত ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। গীতা নিবিষ্টচিত্তে আলো-চনা করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে সুনীতিমূল হিসাবে একেশ্বরবাদমূলক ভাগবত ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা, অপরদিকে "বেদবাদরত"দিগের প্রচলিত যাগযজ্ঞাদির দ্বারা জনসাধারণের মন ভুলাইবার চেষ্টা, এই উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ মহাভারতের সময়ে সঞ্জাত হইয়াছিল। ক্রমে তাহারই অনুষঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধের দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার ফলে ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরদেশ হইতে অবনতির পাতালপুরীতে নামিয়া গেল, এবং কালক্রমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার কবুলতিতে স্বাক্ষর করিতে ভারতবাসী কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যের অপভ্রংশের, ব্রাহ্মণ্যের নামে অযথা অহঙ্কার-অভিমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে তো দাঁড়ানই নাই, বরঞ্চ তাহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া শত্রুমিত্র আর্য্য ও অনার্য্য সকলেরই অনন্য-পূর্ব্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের চরণ ধৌত করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যামূলক প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যকে বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। তিনি উহাতে যে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই বলে আজও আমরা—ভারতবাসী আমরা ধর্ম্মজগতে মাথা তুলিয়া চলিতে পারিতেছি।

১১। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল কোথায়?

মহাভারতের অন্তভাগ পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে, এই কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধের পরিণামে এক মহাবৈরাগ্যের ভাব ভারতের সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। দশ অক্ষৌহিণী এবং সাত অক্ষৌহিণীর পরস্পরের হত্যাসাধক সংগ্রামের ফলে বোধ হয় সে সময়ে গৃহে

গৃহে, প্রত্যেক পরিবারে মৃত্যু স্বীয় ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। অপরদিকে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি রাজার জন্মদান করিল। স্বভাবতই তাঁহারা ছলেবলে-কৌশলে পরস্পরের রাজ্য হরণ করিয়া নিজ নিজ রাজ্যের বিস্তৃতিসাধনে সচেষ্ট থাকিতেন। তাহার ফলে রাজন্যবর্গের মধ্যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রজাগণের সন্তোষবিধানার্থ যাগযজ্ঞ বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমে প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের একপ্রকার অনাস্থা আসিয়া পড়িল। শতবিধ দুর্নীতিমূলক অনাচার ও কদাচারসকল সমাজের গভীর অন্তস্তলে শিকড় নামাইয়া সমাজকে মৃত্যুমুখে টানিয়া চলিতে লাগিল। ধর্ম্মপিপাসু সাধুগণ জনসমাজ হইতে একপ্রকার বিতাড়িত হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে বা গহন কাননসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মনে হয়, এই সময়েই, এখন হইতে নূনাধিক আড়াই হাজার বৎসর নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলবীজসকল প্রোথিত হইয়াছিল। সেই সময় অবধি তথাগত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের মধ্যে যে কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত সমাজবিপ্লব, কত ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, সে সমুদয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ আজও ইতিহাস নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই। কিন্তু ইতিহাস ঐ মধ্যবর্ত্তী সময়ের যেটুকু পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, ঐ সময়ে নানাবিধ বিপ্লবের বড় একটা অভাব ঘটে নাই। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়াও অনেক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল।

১২। বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট দান।

তথাগত বুদ্ধদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময়ে ঐ প্রকার বিপ্লবসমূহের পরিণামে ভারতভূমি অবনতির একটা গভীর স্তরে নামিয়া গিয়াছিল। জনসাধারণ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব যত বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, সত্যের উপর যতদূর দাঁড়াইতে পারুক আর নাই পারুক, তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বরের মোহজালে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং কতকগুলি চিরাগত সংস্কৃত ভাষাগত সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বাঁধিবুলি দ্বারা তাহাদিগকে বিমুগ্ধ বা hypnotised করিয়া রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই বিমোহনের বাঁধ বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম ভাঙ্গিয়া দিয়া সত্যকে, ধর্ম্মকে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য কোন গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য না পাইলেও আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া খণ্ড খণ্ড আকারে এই বিষয়ে আন্দোলন আলোড়ন চলিয়াছিল—বুদ্ধদেবে সেই সমস্ত আন্দোলন সংহত আকারে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। মার্কিন পণ্ডিতপ্রবর এমার্সনের মতে যে ফুলটী ফুটিয়া উঠে, আমরা যে ফুলটীকে যে আকারে দেখি, সেই ফুলটীর প্রত্যেক পাঁপড়ি, প্রত্যেক রেণু, প্রত্যেক অণুপরমাণু ঐ আকার ধারণ করিলে তবেই সমগ্র ফুলটী ঐ আকারে বিকশিত হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়। সেইরূপ আমাদের এই অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, তদানীন্তন সমগ্র জনসমাজের অন্তরে সত্যধর্ম্ম প্রভৃতির তত্ত্ববিষয়ে সহজ ভাষায় সহজ ভাবে জ্ঞানলাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বুদ্ধদেবের ভিতর দিয়া সংহত আকারে প্রকটিত হইয়া উঠিল—তিনি সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত ভাষায় সহজভাবে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য ভাঙ্গিয়া মানবের প্রাণের ভাষার সাহায্যে মানবের প্রাণে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই ভগবান বুদ্ধদেবের এক অপূর্ব্ব দান। তাঁহার পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ে সংস্কৃতবর্জ্জনের সম্ভবপরতা কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে নাই।

১৩। বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় মহাদান—অহিংসা।

তাঁহার দ্বিতীয় অমোঘ দান হইতেছে অহিংসাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে যাগযজ্ঞের উপলক্ষ্যে নানাবিধ জীবজন্তুর, এমন কি মানুষেরও বলি দেওয়া প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি তো কথায় কথায় সম্পন্ন হইত, আবশ্যক বোধ হইলে নরমেধও বাদ যাইত না। এই সকল "মেধ" বৈদিককালেও প্রচলিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। অনেক স্থলে ইহার এমন ভাবে উল্লেখ দেখা যায় যে, মনে হয় যেন, উহার দ্বারা বৈদিক কালেরও বহু পূর্ব্ব অবধি প্রচলিত থাকিয়া বৈদিক কালেও নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বৈদিক কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল "মেধ" প্রত্যক্ষভাবে জীব-মনুষ্যের বধসাধন দ্বারা সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ—আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে করি যে, "মেধ" শব্দে ঐ সকল জীব ও মানুষের পূজাই উপলক্ষিত হইত। যাই হোক, বুদ্ধদেবের সময়ে আর ঐ প্রকার পূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু চারিদিকে যাগযজ্ঞের নামে শত শত জীবজন্তু দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদত্ত হইত।

১৪। বৌদ্ধভাব বলিবিরোধী কেন?

এই প্রথার যে রেশ বর্ত্তমান কালেও নামিয়া

আসিয়াছে, তাহা হইতেই ইহার প্রাচীন ভীষণ ভাব কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে। ছোটনাগপুরের রাজার নিকট শুনিয়াছি যে, দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন তাঁহার রাজধানীতে পাহাড়ের উপরিস্থিত রাজমন্দিরে ১০০ মহিষ এবং ১০০০ ছাগ বলি দেওয়া হয়। বলি দিবার প্রণালী শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়—মুসলমানদিগের হালাল করিবার প্রথার সঙ্গে তাহার কোনই পার্থক্য দেখা যায় না; মহিষকে এমনভাবে হাত-পা বাঁধিয়া দাঁড়করানো হয় যে, সে কিছুতেই তাহার ঘাতকদিগকে কোনরূপে আঘাত করিতে না পারে। তখন প্রধান ঘাতক প্রথমে একটী আঘাত করিবামাত্র চারিদিক হইতে অন্যান্য ঘাতকেরা তাহাকে আঘাত করিতে থাকে। অবশেষে যখন সে আঘাতের বেদনায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন সেই পাহাড়ের উপর হইতে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়—সে পাহাড়ের পাদদেশে পড়িয়া মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে। এইরূপে একটী একটী করিয়া ১০০টী মহিষ বলি দেওয়া হয়। ছাগবলির তো কথাই নাই—একএকটীকে ধরা হয় আর ঘাড়ে খাঁড়ার কোপ দেওয়া হয়—সেই এক কোপে মরিল কি বাঁচিল তাহা দেখিবার কোন অবসরই থাকে না, কোপ দিয়াই তাহাকে ঠেলিয়া সেই পাহাড়ের উপর হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়—মৃত্যু আসিয়া তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করে! কি ভীষণ চিত্র! এই একটী চিত্রের কথা ভাবিলেই তো মাথা ঘুরিয়া যায়, আর যখন দিকে দিকে, গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে এইভাবে জীবহত্যার স্রোত চলিতেছিল, তখন তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেবের করুণাসিক্ত হৃদয় যে দুঃখে শোকে বিদীর্ণ হইবে, তিনি যে বৈদিক প্রথার নামে প্রচলিত হিংসার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অহিংসা-ধর্ম্মের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এখানেও আমার মনে হয় যে, সেই সময়ে জীববলির ভীষণতা দেখিয়া জনসাধারণের মতিগতি তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল; জনসাধারণের সেই বিদ্রোহী ভাবই বুদ্ধদেবের ভিতর দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ

ওঁঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব।*

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বিদ্যার্ণব এম-এ)

সকল উপনিষদেই ওঙ্কারের উল্লেখ আছে; বিশেষভাবে প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, মাণ্ডুক্য ও কঠোপনিষদে ইহার তত্ত্ববিষয়ে বর্ণনা আছে।

প্রশ্নোপনিষদে—

এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।
তস্মাৎ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।
৫ম প্রঃ ।২।

তিনি (পিপ্পলাদ ঋষি) সত্যকামকে বলিলেন, এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি এই ওঙ্কাররূপ আয়তন (আলম্বন, উপায়) দ্বারা পর ও অপর ব্রহ্ম, এই দুয়ের একক প্রাপ্ত হয়েন।

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ।৭।

তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন ঋক্‌সকলের দ্বারা এই লোক (মনুষ্যলোক), যজুঃসকলের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং সামসকলের দ্বারা সেই লোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, যাহা জ্ঞানীগণ জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই (ব্রহ্মলোক) ওঙ্কার-সাধন দ্বারাই প্রাপ্ত হয়েন। এমন কি, যিনি শান্ত (প্রপঞ্চাতীত), অজর, অমর ও অভয় তাঁহাকেও জ্ঞানী ব্যক্তি (সেই সাধন দ্বারাই লাভ করেন)।

তৈত্তিরীয়—

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্ ।১। ৮
ওঁ এই শব্দ ব্রহ্ম। এই সমুদয়ই ওঁ।

ছান্দোগ্য প্রথমাধ্যায়ে—

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ।১।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ। অপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ্‌রসো বাচ ঋগ্‌রস ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ ।২।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধঃ। ৩

কতমা কতমর্ক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি ।৪।

বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ
তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ।৫।
তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে ।৬।
ছা ১।৩।১

ওঁ এই অক্ষররূপী উদ্গীথের উপাসনা করিবেক।
ওঁ-শব্দপূর্ব্বক সামগান করা হয়।

পৃথিবী এই সমুদয় ভূতের রস (উদ্ভব, স্থিতি ও লয়ের হেতু)।

জল পৃথিবীর রস (জলে পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত)।

* মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

ওষধিসকল জলের রস (জলের পরিণাম), পুরুষ ওষধির রস (পুরুষ-দেহ অন্নের পরিণাম হেতু), বাক্ পুরুষের রস, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্গীথ *।২

এই যে অক্ষররূপী উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার, ইহা রস-সমূহের মধ্যে রসতম, শ্রেষ্ঠ পরমাত্মস্থানীয়।৩।

কোন্-কোন্টী ঋক্, কোন্-কোন্টী সাম, কোন্-কোন্টী উদ্গীথ বলা হইতেছে।৪।

বাক্ই ঋক, প্রাণই সাম, ওম্ এই অক্ষরই উদ্গীথ। বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সাম এই দুই-দুইটী যুগ্ম।৫।

এই দুই-দুইটী যুগ্ম ওঁ এই অক্ষরে সৃষ্ট হয়।৬।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে—

ওঁমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্
ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব
যচ্চান্য‌ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।১।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।২।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-মুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।৫।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।৬।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং (নোভয়তঃপ্রজ্ঞং)
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।৭।

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি।৮।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তে-রাদিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়-ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিঃ সমানশ্চ ভবতি নাস্যা-ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ।১০।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতের-পীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।১১।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাঽত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ।১২।

১। ওঁ এই অক্ষরই সকল। ইহার ব্যাখ্যান এই যে, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সমুদয়ই ওঙ্কার। যাহা কিছু তিন কালের অতীত, তাহাও ওঙ্কার।

২। এই সমুদয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আত্মা। এই আত্মা চতুষ্পাদ।

৩। (আত্মার) প্রথম পাদ বৈশ্বানর। ইনি জাগরিতস্থান বহিঃপ্রজ্ঞ (বহির্ব্বিষয়ের অবভাসক) সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখ স্থূলভুক্।

৪। (আত্মার) দ্বিতীয় পাদ তৈজস। ইনি স্বপ্ন-স্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ সূক্ষ্মবিষয়ভুক্।

৫। (আত্মার) তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞ। ইনি সুষুপ্তি-স্থান। সুপ্ত ব্যক্তি যে স্থলে কামনার বিষয় কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুষুপ্ত। সুষুপ্তস্থান একীভূত, প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দময়—এইজন্য ইনি আনন্দ-ভুক্। চেতনা ইহার মুখ।

৬। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সমুদয়ের উৎপত্তিস্থান এবং ভূতসকলের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ।

৭। যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ (অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নের অন্তরালাবস্থাযুক্ত) প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণরহিত, অচিন্ত্য, অব্যপ-দেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। ইহাকেই (জ্ঞানীগণ) চতুর্থ বলিয়া জানেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৮। সেই এই আত্মা ওঙ্কার। ওঙ্কারের অক্ষর ও মাত্রা অবলম্বনে পাদ ও মাত্রা। অকার উকার ও মকার পাদ ও মাত্রা।

৯। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার। তিনি আপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা আদিমত্ত্ব-বশতঃ প্রথম মাত্রা অকার। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং আদি হয়েন।

ভাবার্থ—

অকার দ্বারা যেমন সমুদয় বাক্য ব্যাপ্ত আছে, বৈশ্বানর কর্ত্তৃকও তেমনি সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত আছে, ; আর অকার যেমন সমুদয় বর্ণের আদি, বৈশ্বানরও তেমনি পাদসমূহের আদি। এই সাধারণত্ব বশতঃ বৈশ্বানর ও অকারের একত্বসাধন হইতেছে।

* উদ্গাতা যে সামগান করেন, তাহাতে সবসমেত সাতটী ভাগ আছে,—(১) প্রস্তাব, (২) উদ্গীথ, (৩) প্রতিহার, (৪) উপদ্রব (৫) নিধন, (৬) হিংকার, (৭) প্রণব।

১০। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার। তিনি উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্ববশতঃ দ্বিতীয় মাত্রা উকার। (এখানে অকার হইতে উকারকে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। তাহা যাহাই হউক, মধ্যবর্ত্তিত্ব এইজন্য বলা হইয়াছে যে, উকার যেমন অকার ও মকারের মধ্যস্থ, তেমনি তৈজস বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ। এই সাধারণত্ব জন্য তৈজস ও উকারের একত্ব স্থাপিত হইতেছে।)

যিনি এরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞানপ্রবাহের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং ইহার ফলে (শত্রু মিত্র সকলের নিকট) সমান হন এবং তাঁহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না।

১১। যিনি সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ, তিনি মিতত্ব বা একীভূতত্ব বশতঃ তৃতীয় মাত্রা মকার। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সকলের পরিমাণ করেন ও এক হন।

ভাবার্থ—সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস বাহ্য-জগৎ ও মনোজগৎ প্রাজ্ঞে প্রবেশ করেন এবং জাগ্রতা-বস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হয়েন। আধার দ্বারা কোন এক বস্তুর পরিমাণ করিতে হইলে যেমন সেই বস্তুটীকে একবার আধারে প্রবেশ করাইয়া তাহা হইতে পুনরায় বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে প্রবেশ ও তথা হইতে নির্গমন করাতে প্রাজ্ঞ যেন এতদুভয়ের পরিমাণ করিতেছেন। তদ্রূপ ওঙ্কারের উচ্চারণান্তে অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করে, উচ্চারণারম্ভে পুনরায় বহির্গত হয়। সুতরাং এতদুভয় স্থানেই পরিমাণক্রিয়ার সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। আর একটী সাদৃশ্য এই, বৈশ্বানর ও তৈজস সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞে একীভূত হয়েন, তেমনি ওঙ্কার-উচ্চারণান্তে অকার ও উকার যেন মকারে একীভূত হয়। এইজন্য প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব।

১২। মাত্রাশূন্য, চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চাতীত, শিব ও অদ্বৈত। এইরূপ ওঙ্কারই আত্মা। যিনি এরূপ জানেন তিনি পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন।

মর্ম্মার্থ—

১। যাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত তাহা লইয়াই ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। এতদতিরিক্ত যাহা ব্রহ্মের ভিতর অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা তিন কালের অতীত।

২। ব্রহ্ম এই আত্মা—ইহা বলিতে বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞানাতীত, মাত্র তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পরোক্ষ বস্তুরূপে তিনি আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। যখন আত্মা হইয়া প্রকাশ পান, তখন তিনি অপরোক্ষ সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন।

৩। বৈশ্বানর ব্রহ্মের বিশ্বরূপ—বহিঃপ্রজ্ঞ দৃক্‌শক্তি, যিনি জাগরিত অবস্থায় আপনাকে ছাড়া বাহিরের বিষয়-সকল জানিতেছেন। দ্যুলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী ও আহবনীয় অগ্নি এই সাতটী তাঁহার অঙ্গ; এবং এই সাতটী লইয়া বিরাট রূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনিশটী মুখ দ্বারা তিনি স্থূল বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকেন।

৪। তৈজস বিষয়শূন্য প্রকাশমাত্র। তিনি অন্তঃ-প্রজ্ঞ বলার তাৎপর্য্য এই যে, বাসনাকারে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত দ্যুলোক প্রভৃতি সাতটী সূক্ষ্ম অঙ্গকে বিষয় করিয়া সূক্ষ্মজ্ঞানাকারে ভাসমান পূর্ব্বোল্লিখিত একোন-বিংশতি মুখ দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ভোগ করেন।

তিনি বৈশ্বানর, তিনি তৈজস এবং তিনিই প্রাজ্ঞ। প্রজ্ঞা বলিতে স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিকে বুঝায়। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যশক্তি (বিষয়) দৃক্‌শক্তি (বিষয়ীর) অতিরিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু সুষুপ্তিতে ইহারা বিষয়ীর সঙ্গে এক হইয়া যায়। তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞকে এইজন্য একীভূত বলা হইয়াছে। বিষয়-সমূহের জ্ঞান প্রজ্ঞান। এই অবস্থায় এই সকল জ্ঞান আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া আর অনুভূত হয় না। ইহারা যেন অবিভক্ত ভাব গ্রহণ করিয়া জমাট একত্বরূপ ধারণ করে, এইজন্য ইহা প্রজ্ঞানঘন। প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় একমাত্র আনন্দেরই অনুভূতি থাকে। তাই দেখা যায়, যখন সুষুপ্তি অবস্থা (গভীর নিদ্রা) হইতে কেহ জাগরিত হয়, বলিয়া উঠে—আহা, কি আরামেই নিদ্রা গিয়া-ছিলাম—কি সুখ! সুষুপ্তির এই যে স্মৃতি, ইহা আনন্দানু-ভূতের জ্ঞাপক; এই নিমিত্ত প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়। এই আনন্দই সমুদয়ের মূল (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে); সমুদয়ের মূল হওয়াতে আনন্দকে স্রষ্টার স্বরূপ বলা হয়। সুষুপ্তাবস্থায় জীব পরমাত্মাতে প্রবেশ লাভ করিলে পর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু জীবাত্মা চিচ্ছক্তির অংশ (অণুচৈতন্য) হওয়ায় তাহার চেতনা সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান তিরোহিত হওয়ার পর যে আনন্দ অবশেষ থাকে, সেই আনন্দে আনন্দময় হইয়া সে আনন্দের ভোক্তা হয়। চেতনাযোগে আনন্দসম্ভোগ হয় বলিয়া চেতনাকে মুখ বলা হইয়াছে। জীবের এইরূপে যে আনন্দের সম্ভোগ হয়, সেই আনন্দ প্রাজ্ঞের স্বরূপ।*

৬। প্রাজ্ঞকে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের প্রসবিতা, ভূতসকলের উৎপত্তি ও নিরোধস্থল—এই

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ।
২য় মুণ্ডক—১ম খণ্ড, ১ম শ্লোক।

সকল বিশেষণে বিশেষিত করায় এই অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে যে, যিনি সৃষ্টির আরম্ভে জীবকে লইয়া জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি প্রাজ্ঞ। জীব ও জগতে তিনি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান।

৭। যাহা চতুর্থপাদ—তাহা অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞও নহেন। উভয়প্রজ্ঞ দ্বারা যিনি জাগ্রত ও স্বপ্ন এই উভয়ের অন্তরালস্থ বিষয়জ্ঞ, তাহাকে জ্ঞাপন করিতেছে। এই তিনের সঙ্গেই জীব ও জগতের সম্বন্ধ আছে।

তিনি প্রজ্ঞানঘন নন, সুষুপ্তাবস্থায় জীব প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় স্থিতি করেন। তিনি প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন। প্রজ্ঞ বলিতে পরা প্রকৃতি, অপ্রজ্ঞ বলিতে অপরা প্রকৃতি বুঝায়। এই সকলের অতীত যাহা, তাহা তুরীয়। এই তুরীয় শব্দ সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের জ্ঞাপক। প্রজ্ঞা ব্রহ্মের নিত্যস্বরূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা অব্যক্ত থাকে মাত্র। সৃষ্টির আরম্ভে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "আমি ব্রহ্ম" কর্ত্তৃত্ববাচক যে আমি, এইরূপে তিনি প্রকাশ পান। এই কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মে নিত্য সিদ্ধ, এবং প্রাজ্ঞের যে আনন্দময়ত্ব তুরীয়ে তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ইহা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে, ইহার কোন লক্ষণ নাই, যাহা দ্বারা ইহাকে চিন্তার বিষয় করিতে পারা যায়; ইহা চিন্তার অবিষয় ও বাক্যের অগোচর। কিন্তু স্বপ্ন-জাগ্রদাদি সকল অবস্থার মধ্যে সেই একই আত্মা, এই যে প্রত্যয় নিরন্তর বিদ্যমান থাকে, সেই প্রত্যয়ই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ; সুতরাং তিনি একাত্মপ্রত্যয়সার। পুনশ্চ রূপ-রসাদি বিষয়প্রপঞ্চ লইয়াই এই জগৎ—তাঁহাতে এই সকলের নিবৃত্তি হইয়াছে, তাই তিনি জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ-বর্জ্জিত। বিকার জগতের ধর্ম্ম। জগতের সঙ্গে সম্বন্ধবর্জ্জিত বলিয়া তিনি অবিকারী; সুতরাং শান্ত শিব ও অদ্বৈত। এই যে চতুর্থ, তিনি আত্মা এবং তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৮। এই যে সমুদয় জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত আত্মা, সেই এই আত্মা ওঙ্কার।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে বলা হইয়াছে "ওমিতি ব্রহ্ম। ও ইতি ইদং সর্ব্বম্।" মাণ্ডুক্য উপনিষদে ব্রহ্মের চতুষ্পাদের দ্বারা এই তত্ত্বটাই বিশদভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, এবং স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া আরোহণক্রমে যিনি সর্ব্বাতীত অব্যবহার্য্য অব্যপদেশ্য অচিন্ত্যপরং, তাঁহাতে আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে।

বৈশ্বানর—জাগ্রত অবস্থায় বহির্জগৎ, তৈজস—স্বপ্নাবস্থায় মানস জগৎ, প্রাজ্ঞ—সুষুপ্তাবস্থায় স্বয়ং জীবের আনন্দানুভব। এই তিন অবস্থায় যে আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইতে ব্রহ্মানুসন্ধান উপস্থিত হয়; এবং যথাক্রমে পরিশেষে এই অবস্থাত্রয়ের অতীত, যাহাকে তুরীয় বলা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পায়। প্রথমোক্ত তিন পর্য্যায়ে যে দর্শন, তাহা পরোক্ষদর্শন। তুরীয় সাক্ষাৎদর্শন।

বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি উপনিষদে এই তত্ত্বটীর ব্যাখ্যা আছে।

বৃহদারণ্যকের গল্পটী এই :—

বিদেহাধিপতি জনক যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বলিলেন—:

হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে উপদেশ দিন; যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্ আপনি দূরপথ গমনের ইচ্ছা করিলে যেমন রথ ও নৌকা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনি এই সকল উপনিষদ অবলম্বনে মুক্তাত্মা হইয়াছেন।

আপনি পূজাস্পদ, আপনি সমৃদ্ধ, আপনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, উপনিষদযোগে সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন। বলুন, এই দেহবিয়োগে আপনি কোথায় গমন করিবেন? জনক বলিলেন—আমি জানি না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন কোথায় যাইবেন, বলিতেছি—

"এই দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ বিদ্যমান, ইঁহার নাম ইন্ধ। এই সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ইন্ধকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলা হয়। পরোক্ষ ভালবাসেন, প্রত্যক্ষ দ্বেষ করেন।

এই বাম চক্ষুতে সেই পুরুষ ইন্ধ বিরাজমান্। বিরাট্ ইঁহার পত্নী। এই হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ, সেই আকাশ এই দুইয়ের স্তবস্থান। এই হৃদয়ে যে রক্তপিণ্ড, ইহা এই দুইয়ের ভোজ্য। এই হৃদয়ের মধ্যে যাহা জালের মত আছে, উহা এই দুইয়ের আবরণ-বস্ত্র। এই হৃদয় হইতে উর্দ্ধদিকে যে নাড়ী প্রসারিত হইয়াছে, এই নাড়ীই এই দুইয়ের সঞ্চরণপথ। একটী কেশের সহস্রভাগের একভাগ পরিমিত সূক্ষ্ম হিতা নামক নাড়ীগুলি হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল নাড়ী দ্বারা সঞ্চরণশীল আহার্য্যসকল ইতস্ততঃ দেহে বিচরণ করে। সেই জন্য এই তৈজস আত্মা এই শারীরপুরুষ (বৈশ্বানর) অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আহারের ভোক্তা।

অক্ষিগত আত্মা বিশ্ব, হৃদ্গত আত্মা তৈজস, প্রাণগত আত্মা প্রাজ্ঞ। বিশ্ব তৈজস প্রাপ্তির পর প্রাজ্ঞসহ একীভূত সেই সাধকের পূর্ব্বদিক পূর্ব্ব প্রাণসমূহ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণপ্রাণসমূহ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণসমূহ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণসমূহ, ঊর্দ্ধদিক্ ঊর্দ্ধপ্রাণসমূহ, অধোদিক্ অধঃপ্রাণসমূহ, সকল দিক্ সকলপ্রাণসমূহ। সেই সর্ব্বাত্মা এই পর্য্যন্ত নন, এই পর্য্যন্ত নন। ইনি অগ্রাহ্য, এজন্য কাহারও দ্বারা গৃহীত হন না; অশীর্য্য,

এজন্য কাহারো কর্তৃক বিভক্ত হন না; অসঙ্গ, সুতরাং কাহারও কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হন না। বন্ধনরহিত, এজন্য ব্যথিত হন না। ইহার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইবে।

অক্ষিগত আত্মা বিশ্ব বাহ্য জগতের দ্রষ্টা। প্রাণগত আত্মা প্রাজ্ঞ—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্য্যামী—দৃষ্টি যতদুর যায় ততদুর অন্তর্য্যামী। প্রাজ্ঞের প্রেরণা অনুভূতির বিষয় হয়। উত্তরদক্ষিণ পূর্ব্বপশ্চিম উর্দ্ধ অধঃ দ্বারা প্রাজ্ঞের সর্ব্বদিগ্‌দেশব্যাপিত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু এখানেই তাঁহার সীমা হইল না। সেই সর্ব্বাত্মা এই পর্য্যন্ত নন এই পর্য্যন্ত নন। ইহাতে বলা হইতেছে, যাহা অদ্যাপি অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতেও তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বাতীত তুরীয় বিজ্ঞাপিত হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রায়, সাধক যখন সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত এই উভয়ের জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—তখন তাহার অভয়প্রাপ্তি হয়।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার প্রাচীন কাহিনী।

(১—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১২৫৪ সাল :—ডেবিড হেয়ার স্মৃতিসভা।

(৪ জুন ১৮৪৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪)

গত ১ জুন মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল কালেজের থিয়েটরে মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নামের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি বৃহের সাম্বৎসরিক নিয়মিত সভা হইয়াছিল, শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সভার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কারের ঘরের শিক্ষক শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অসাধারণ বদান্যতা ও অন্যান্য মহদ্‌গুণ বিষয়ে বঙ্গভাষার এক অত্যুত্তম রচনা পাঠ করেন, তাহা শ্রবণ করত সভাস্থ সকল লোকেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত সন্তোষপূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন যে তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাধারণের হিতজনক ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং তিনি সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন যে, কালেজের অন্যান্য বিদ্বান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হউন।

তদনন্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পঠিত পত্র কমিটিতে প্রদান করিবেন, এবং কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহা মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক সাধারণকে দিবেন।

পরে রেবরেণ্ড সভাপতি মহাশয় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করত বলিলেন যে সকলে বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ কমিটির মূলধন হইতে একশত টাকা উদ্বর্ত্ত হওয়াতে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার উন্নতি জন্য এরূপ ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অল্পবয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ঐ টাকা পারিতোষিকরূপে প্রদান করা যাইবেক, এবং ঐ কমিটির মূলধন ক্রমে বৃদ্ধি হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারিতোষিক দান দ্বারা বঙ্গভাষা রচনা বিষয়ে বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহী করিবেন, রেবরেণ্ড মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাস্থ মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, তদনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

কার ঠাকুর কোম্পানী।

(৪ এপ্রিল ১৮৪৮। ২৩ চৈত্র ১২৫৪)

আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিস্তয়ার্স কার ঠাকুর কোম্পানীর অংশিগণ এক সরকুলর পত্র দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুয়ারি মাসে তাঁহারা চলিত কার্য্য রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজনদিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত ১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুরা হৌসের ঋণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর কোম্পানীরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা অতি সুনিয়মে বাণিজ্য কার্য্য করিতেন, অধুনা ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।

১২৫৫ সাল :– ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ।

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ।—

বৈশাখ :—এজুকেশন্ কৌন্সেলের অধ্যক্ষেরা হিন্দু কালেজে সংগীত বিদ্যার অনুশীলন রহিত করেন।... ছাপা যন্ত্রের প্রধান উপকারী পরম কারুণিক দেশহিতৈষী বন্ধু ৺বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় ১৯ বৈশাখ শনিবার দিবসে বিস্থচিকা রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

জ্যৈষ্ঠ :—কুমারহট্টের খাসবাটী পল্লীতে এক বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে।...হেয়ার সাহেবের নামে বিখ্যাত বিদ্যালয় নুতন বাটীতে স্থাপিত হয়।...ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটির ষষ্টদশ গণিত রিপোর্ট পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাতে মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতার ভাবদ্ব্যাপার লিখিত হইয়াছে, যে বৎসর ঐ সোসাইটি স্থাপিত হয় সেই বৎসর উক্ত বাবু চাঁদার পুস্তকে ১০০ টাকা স্বাক্ষর করেন, পরে বার্ষিক ১০০ টাকা দান করেন, পরন্তু আবার এককালীন ২০০০ তঙ্কা দেন, তৎপরে ৫০০ টাকা এবং ১৮৩৮ সালে একেবারে লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করেন, তাহার বৃদ্ধি হইতে অনেক অক্ষম লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

পৌষ :—সদর আদালতের জজেরা খাসআপীল ঘটিত মোকদ্দমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সরদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্ত রাজনারায়ণ দত্ত [মাইকেল মধুসূদনের পিতা] প্রভৃতি কয়েকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।

ছাতুবাবুর পুত্র গিরিশচন্দ্র দেব।

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

বাবু গিরিশচন্দ্র দেব।

আমরা গত ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে এক অমূল্য তুল্যরহিত বন্ধুরত্ন -বিহীন হইয়াছি। এই প্রভাকর পত্রের প্রধান আনুকূল্যকারি বহুগুণধারী সিমুলানিবাসী বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের প্রিয় পুত্র বাবু গিরিশচন্দ্র দেব উক্ত দিবস সাংঘাতিক জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া এতন্নিখিল সংসার পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।...তিনি আপন পিতৃব্য ও পিতার নিকটে প্রতিমাসে প্রচুরার্থ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্ভিন্ন পরিয়র কোম্পানীর হৌসে মুচ্ছদ্দির কর্ম্মে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তথাচ...শুদ্ধ সৎকর্ম্মে তত্তাবৎ ব্যয় করত আবার ঋণী হইতেন।...

আমারদিগের মৃত বন্ধুর সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজের অধীনে কতিপয় বিপ্রনন্দন কাশীধামে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার দানে অনেক পাঠশালা ও সভা এবং প্রকাশ্য বিষয়ের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার যদ্রূপ যত্ন ছিল, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা হইতে পারে না,...।

অন্তঃকরণে সততই বোধ হয়, গিরিশবাবু অবনী পরিত্যাগ করেন নাই, যেন বেলগেছিয়ার মনোহর বাগানে অথবা পাণিহাটীর গঙ্গাতীরস্থ সুচারু নূতন উদ্যানে গমন করিয়াছেন এখনি আসিয়া আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।......

স্বর্গবাসী গুণরাশি ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের দুই পুত্র, প্রথম আশুতোষ তুল্য বাবু আশুতোষ দেব, দ্বিতীয় স্বধর্ম্ম তৎপর বাবু প্রমথনাথ দেব, উক্ত উভয় ভ্রাতার মধ্যে গিরিশবাবু একাকী কেবল দেব বাবুদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী এবং বংশধর ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ মুদ্রার স্বত্বাধিকারী হইতেন। ... ... বাবু ২৪ বৎসর বয়সে অদৃশ্য হইলেন, এতৎ সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে প্রবীণের ন্যায় অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, ...। সংগীত বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল, তাঁহার মরণে ঐ বিদ্যা সহগামিনী হইয়াছে, অর্থাৎ কলিকাতার একেবারে তাহার পাঠ উঠিয়াছে, আমোদ উল্লাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বাবু সেতার বাজনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন, ...। তাঁহার সকল স্বরূপ গুণ লিখিয়া শেষ হইতে পারে না। তিনি প্রতিদিবস প্রাতে অনেকগুলিন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রলোককে চারি আনা, আট আনা ও একটাকা দান করিতেন, আপন ব্যঙ্গে বাটীতে এক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া সাধারণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন, ...।

ধর্ম্মসভার ভগ্নদশা।

(১৬ মে ১৮৪৮। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক। অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্ম্মসভার গৃহে ধর্ম্মসভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগী চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন ইহা অস্মদাদির বিশেষ প্রার্থনা বটে, কিন্তু স্থিররূপে বিবেচনা

করিলে প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদক দিগ্যে ধর্ম্মঘটিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর সম্বন্ধ রাখা আরো অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন ও সকল বিষয়ের বিচারক স্বরূপ,…। আমাঃদিগের সহযোগী যখন ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইলেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় এবং লেখনীকে যাজ্জীবনের জন্য উক্ত সভার নিকট বিক্রীত করিতে হইল, তদ্বিষয়ে স্বাধীনরূপে আর স্বাভিমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ধর্ম্মসভার কার্য্যঘটিত রাশি রাশি দোষকে গোপন করিয়া বিপরীতার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক,…।

ধর্ম্মসভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁকজমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের মর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, কেমনা :এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে, সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত যৎকালীন ঐ সভার সৃষ্টি হয়, তৎকালীন দেশের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, ধর্ম্মবিষয়ের গোলযোগে অনেকের মনে নানা প্রকার ভাবের আন্দোলন হয়, হিন্দুগণ ভিন্ন ভিন্ন দলাক্রান্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ কলহে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকলেরি আত্মপর হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়াছিল, সে সময়ে প্রতিযোগীপক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য এবং দলপতিবর্গ পরস্পর স্থিরপ্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করেন, কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্ম্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন, সে ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, "ধর্ম্ম" আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহারদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন, অর্থাৎ মৃত মহাত্মা লার্ড উইলিএম বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আপীল করেন, সেই আপীলের মোকদ্দমায় পরাজয় হইলেন, চাঁদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা, ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড় ভুড়ি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যথার ব্যথী ব্যথী সাহেবের উদরাগ্নি স্বাহা হইল, মূল আশা ভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সভ্যেরা আর কি করেন, কিছুই ভাবিয়া পান না, সভার ফাঁদুনি করিয়া ছাঁদুনী ও বাঁধুনী মাত্র সার হইল, মনসার কাঁদুনী কত গাহিবেন, পরিশেষে বড় বড় চাঁইমহাশয়েরা বুদ্ধির খেই হইতে এক দলাদলির সূত্র তুলিয়া বসিলেন, সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি ভাব হইয়া পরিশেষ ঢলাঢলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সৎকার্য্যের সৎকার্য্য হইল, আর পূর্ব্ববৎ প্রণয়ের সন্ধি রহিল না, দলপতিরা দলচক্রে পড়িয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিলেন, মহামতি সভাপতি সভার গৃহে এক হাড়িকাষ্ঠ লগ্ন করিলেন, তাহাতে প্রতিদিন শত শত ব্রহ্মবলি হইতে লাগিল, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" ধনীদিগের নিকট 'কোন কর্ম্ম উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বিদায় পাওয়া যাঁহারদিগের উপ-জীবিকা হইয়াছে, তাঁহারদিগের উপার্জ্জনের পথে কণ্টক পতিত হইল, যে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সেবক, সেই শূদ্রেরাই পরম পূজনীয় ভূদেবদিগের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে লাগি-লেন, তৎকালীন চন্দ্রিকা পত্রে এক একদিন দলঘটিত যে যে বিষয় প্রকটিত হইত তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইতাম। যথা।

"মহামহিম শ্রীযুত—ঃঃ—দেব,
দত্ত, রাজা বাহাদুর, দলপতি মহাশয়
ধার্ম্মিক বরেষু।

আমারদিগের এবাটীর সকলে শারীরিক ভাল আছেন, তাহাতে ভাবিত নহিবেন, যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক, গত পরশ্ব দিবসে আমারদিগের ওবাড়ীর বড় মহাশয়ের পিশের শালার মামার মেসোর দাদার খুড়ার জামায়ের ভেয়ের মামাশ্বশুর পদব্রজে গমন কালীন সিংহ বাবুদিগের বাটীর সংলগ্ন এক পুরাতন প্রাচীরের একখানা পতিত পাটকেল স্পর্শ করিয়াছেন, অতএব সভার রীতিমতে তাঁহাকে দল হইতে পরিত্যাগ করা উচিত হয় ইত্যাদি"।

এই প্রকার লোকের গ্লানিজনক গ্লানিসূচক বিষয় দ্বারা কিছুদিন ধর্ম্মসভার কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল, পরিশেষ এক নীলকমলি হেঙ্গামা উঠাতেই একদিনে সমুদায় ধাই ফুটফাট হইয়া গেল, রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত, বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু দেবনারায়ণ দেব, এবং বাবু জয়নারায়ণ মিত্র প্রভৃতি দলপতি মহাশয়েরা একত্র হইয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে পরিত্যাগ করত সিমুলায় স্বতন্ত্ররূপে এক ধর্ম্মসভা করিলেন, ঐ সময়ে দেব বাহাদুর একাকী কেবল স্বদল সহিত কলুটোলার ধর্ম্মসভায় রহিলেন, অপর সকল দলপতি সংযোজিত রূপে নূতন সভার সভ্য হইলেন, কিন্তু চমৎকার দেখুন, তাঁহারদিগেরও সেই সংযোগ পরে মিথ্যা হইল, অর্থাৎ তাঁহারদিগের ঘরে ঘরে এমত বিচ্ছেদ হইল যে পরস্পর বাক্যালাপ রহিল না, যজ্ঞসূত্র গ্রহণাভিলাষী গুণরাশি ক্ষত্রি অভিমানী আন্দু-লেশ্বর রাজা বাহাদুর এক বিবাহ সূত্রে শিশুপালের ন্যায় সন্ত্রাস্ত হইয়া সিমুলিয়ার সভা ত্যাগ করত নিজ গ্রামে এক কলমের ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করিলেন, সেই

কলমের বৃক্ষে মধ্যে মধ্যে দুই একটী ফুল ফুটিয়া অমনি অমনি ঝরিয়া পড়ে, ফলের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় না, তদন্তর এক "একজায়ের" ঢেউ উঠিয়া বিবাদের জলের স্রোতে প্রায় সকস সংহার করিয়া বসিল, রাজপরিবারের সহিত দেব বাবুদিগের বিচ্ছেদ হইল, সেই বিচ্ছেদেই সভার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ রাজদলের সহিত ঘোষ বাবু এবং মিত্র বাবু প্রভৃতি কতিপয় দলপতি একত্র হইয়া সিংহ বাবুদিগের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এইক্ষণে ঘরে ঘরে ধর্ম্মসভা যেমন রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বসুর গঙ্গা ইত্যাদি, সেইরূপ অধুনা অমুকের ধর্ম্ম-সভা কলনার ধর্ম্মসভা বলিয়া পরিচয় হইয়াছে।

সত্যযুগে ধর্ম্মের চারি পদ ছিল, ত্রেতাযুগে এক পদ ভগ্ন হইয়া তিন পদ হয়, পরে দ্বাপরে আর এক পদ ভগ্ন হইয়া দুই পদ থাকে, এই কলিযুগে কেবল এক পদ মাত্র আছে, তাহাতে তাঁহার চলিবার শক্তি নাই, অতএব এসময়ে সেই এক ঠ্যাং ধরিয়া টানাটানি করাতে কেবল তাঁহার প্রাণে ক্লেশ দেওয়া হয়। আমারদিগের রাজকৃষ্ণ বাবু চন্দ্রিকার সম্পাদকত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছেন, সুতরাং এখন দলাদলি চক্রে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না, কেননা ইহাতে স্বাধীনতাকে একেবারে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করা হইবেক, সংপ্রতি চন্দ্রিকা পত্রে উত্তম২ বিষয় সকল লিখিত হইতেছে কিন্তু ধর্ম্মসভার নিয়মে দলাদলি ঢুকিলে আর তদ্রূপ থাকিবেক না, পরে জাতিমারণ, হুঁকাবারণ, মানহরণ, বিষ্ণুস্মরণ, প্রতিজ্ঞারক্ষণ, গোবরভক্ষণ ইত্যাদি বিষয় দ্বারা এক একদিনের চন্দ্রিকা পূর্ণ করিতে হইবে, অধুনা ঐ সভা একদোলে সভা হইয়াছে, মধ্যে দেশহিতার্থী বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের বদান্যতায় কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সংপ্রতি তিনি সে শ্রী হরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আপন হস্তে টাকা লইয়া উপায়হীন ভদ্র পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, ইহাতে সভার শোভা আর কি রহিল, কেবল এক নামের অভিমান মাত্র রহিয়াছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি এমত মিথ্যা অভিমানের কার্য্যশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্মে কলঙ্ক প্রদান করা কি উত্তম বিবেচনা হইতেছে ?

জোড়াসাঁকোর সিংহপরিবার।

(১৭ মে ১৮৪৮। বুধবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ।

আমরা অসীম খেদসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যোড়াসাঁকো নিবাসী ধনরাশি ধার্ম্মিকবর ৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় গত রবিবার বৈকালে শ্রীশ্রী৺ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, নবকৃষ্ণ বাবু নবীন বাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। জগদীশ্বর যে সকল মহদ্গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সমস্ত গুণ তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ বাবু বৈষয়িক ব্যাপারে বিলিপ্ত হইয়াও সতত পণ্ডিত মণ্ডিত সভামধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালাপে সুখী হইতেন, সকল প্রকার বিদ্যায় ও ভাষায় তাঁহার বিশেষ সংস্কার ছিল,...। তিনি বিপক্ষদিগের বিপক্ষতা ও নিন্দাকে নিয়তই ক্ষমা করিতেন, তাঁহার আস্য ক্ষণ-কালের জন্য হাস্যহীন হয় নাই, এবং অঙ্গের কোনরূপ ভঙ্গিমাদ্বারা কেহই ক্রোধের চিহ্ন দেখিতে পান নাই, মৃত মহাত্মা বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় যৎকালীন রাম-কৃষ্ণপুরের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে বিবাহ করেন, তৎকালীন ধর্ম্মসভা সংক্রান্ত কলিকাতাস্থ এবং অপরাপর স্থানের দলপতি ও বড়২ ধনশালি জনেরা সিংহ বাবুদিগের বিরুদ্ধে বিধিমতে বিপক্ষতা করণে সাধ্যের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু নবীন বাবুর কি অসাধারণ বুদ্ধি, তিনি ঐ শৈল সম বিপদকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া স্বীয় যুক্তি ও কৌশল শক্তিক্রমে উল্লেখিত বৃহৎ২ বিপক্ষ-দিগকে এককালীন হতগর্ব্ব করত সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হইয়াছিলেন।...

নবীন বাবু এতন্নগরের এক প্রাচীন ধনি পরিবারের অধ্যক্ষ ছিলেন,...অধুনা প্রার্থনা করি সদাত্মা বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় পরিবার সহিত দীর্ঘজীবি হইয়া বংশের নির্ম্মল সম্মান রক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসভা।

(২৫ জুলাই ১৮৪৮। ১১ শ্রাবণ ১২৫৫)

আমরা সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হইয়া অতিশয় সন্তোষ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি মহারাজা মহাতপচন্দ্র বাহাদুর স্বীয় রাজধানী মধ্যে এক ব্রাহ্মসভা সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রায় মাসাবধি হইল তাহার কার্য্য চলিতেছে, প্রতি রবিবারে অধীরাজ বাহাদুর আত্মীয়জনগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত সভারোহণ করিয়া থাকেন, এবং তথায় বহুলোকেরও সমাগম হয়, তত্ত্ববোধিনী সভার বিজ্ঞবর পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ঐ সভায় বেদ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম্য বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার বিস্তর উপকার হইয়াছে, বর্দ্ধমানের রাজসভায় তাঁহার সংযোগ হওয়াতে আমার-দিগের নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে যে অধীরাজ বাহাদুরের মনোগত অভিলাষ অবশ্য সিদ্ধ হইবেক, যাহা হউক এই

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা ও বেদের মর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত সভা সকল অবাধে সংস্থাপিত হওয়াতে আমরা যেরূপ আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইতেছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না,...।

ডেবিড হেয়ার পুরস্কার।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। ৭ আশ্বিন ১২৫৫)

ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্মরণীয় মূলধনের উপস্বত্ব হইতে কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা পুনর্ব্বার ৭৫৲ টাকা ব্যয় করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম এসে অর্থাৎ প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকেই উক্ত টাকা প্রদত্ত হইবেক, ঐ এসে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের ১ মে তারিখে কমিটির সেক্রেটারী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট পাঠাইতে হইবেক, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার পরীক্ষা করিবেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

সিন্ধু ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোন দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {ধা ধা। পধা -র্সা র্সা। র্সধা -র্সণাধ। পা -া ধা I মা পা। পা -ধা পা।
য দি এ০ ০০ আ মা০ ০ র ০ ০ হৃ দ য় ০, দু

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। মপা -ধপা। মজ্ঞা -া -াব I সা -া। রা -া রা। রা -জ্ঞা। মা -পা মা I
য়া০ ০০ র ০ ০ ব ন্ ধ ০, র হে ০ গো ০, ক

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -া। -মা -া -রা। -মজ্ঞা -াব। -সরা -া -া} I {মা গা। মা -ধা ধা।
ভু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ দ্বা র ভে ০ ঙে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| ণা -া[ধ] | পধা -া -া I ণা ধা | ণা -া র্সা | র্সধা র্সণা[ধ] | পা -া -ধা} I
তু ০ মি০ ০ ০ এ স মো ০ র প্রা০ ০ ণে ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা | পা -া পা | পা -ধা | মপা -মণা -া[ধ] I পা [ম]জ্ঞা | -া -া -রা |
ফি রি য়া ০ হে য়ো ০ না০ ০০ ০ প্র ভু ০ ০ ০

০ ১
| -[ম]জ্ঞা -া[র] | -সরা -া -া II
০ ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {মা পা | না -া না | না -া | না -া -পা I না না | র্সা -া র্রা |
য দি কো ০ ন দি ০ ন ০ ০ এ বী পা ০ র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| না -া | র্সা -া -ধা I ণা ণা | ধা -া ধা | ণা -া[ধ] | পা -ধা -া I
তা ০ রে ০ ০ ত ব প্রি ০ য় না ০ ম ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ণা -র্রা | র্সা -ণা ণা | ণধা -পধা | পা -া -ধা} I মা পা | পা -া পা |
না ০ হি ০, ঝং কা০ ০০ রে ০ ০ দ, য়া ক ০ রে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| ণা -া[ধ] | পা -া -ধা I মা পা | পা না না | না -র্সা | র্সা -া -মা I
ত ০ বু ০ ০ র হি য়ো ০, দাঁ ড়া ০ য়ে ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা | পা -া পা | পা -ধা | মপা -মণা -া[ধ] I পা [ম]জ্ঞা | -া -া -রা |
ফি রি য়া ০, যে য়ো ০ না০ ০০ ০ প্র ভু ০ ০ ০

০ ১
| -[ম]জ্ঞা -া[র] | -সরা -া -া II
০ ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
II সা সা | রা -া রা | রা -া | রা -া -জ্ঞা I মা মা | পা -া পা | পা -া |
য দি কো ০ ন দি ০ ন ০ ০ তো মা র ০, আ হ্বা ০

১ ২´ ৩ ০ ১
| পধা -পধা -মা I মা -া[গ] | মা -া মগা | মা -া[গ] | [গ]মা -মা -রা I
নে০ ০০ ০ সু প ্তি ০, আ০ মা ০ র ০ ০

২´ ৩ • ১ ২´ ৩

I রা ঋা। রজ্জা -মপা পা। মঋা -ৠজ্জা। ঋা -া -া I ঋা -া। ঋা -ধা ধা।

চে ত না• ••, না মা• • নে • • ব • য •, বে

• ১ ২´ ৩ • ১

।ণা -াধ। পধা -া -া I ণা ধা। ণা -া র্সা। র্সধা -র্সণাধ। পা -া -ধা I

দ • নে• • • জা গা য়ো, • আ মা• • রে •

২´ ৩ • ১ ২´ ৩

I মা পা। পা -া পা। পা -ধা। মপা -মণা -াধ I পা ৠজ্জা। -া -া -ঋা।

কি রি যা •, যে য়ো • না• •• • প্র ভু • • •

• ১ ২´ ৩ • ১

। -ৠজ্জা -াঋ। -সঋা -া -া I {মা পা। না -া না। না -া। না -া -পা I

• • •• • • য দি কো • ন দি • ন • •

২´ ৩ • ১ ২´ ৩

I না না। র্সা -া র্ঋা। না -া। র্সা -া -ধা I ণা ণা। ধা -া ধা।

তো মা র •, আ স • নে • • আ র কা • হা

• ১ ২´ ৩ • ১

।ণা -াধ। পা -ধা -া I ণা ধা। ণা -র্ঋা র্সা। র্সধা -র্সণাধ। পা -া -ধা} I

রে • ও • • ব সা ই •, ব ত• • নে • •

২´ ৩ • ১ ২´ ৩

I মা পা। পা -া পা। ণা -াধ। পা -া -ধা I মা পা। পা -না না।

চি র দি • ব সে • র • • হে, রা জা •, আ

• ১ ২´ ৩ • ১

।না র্সা। র্সা -া -মা I মা পা। পা -া পা। পা -ধা। মপা -মণা -াধ I

মা • র • • কি রি যা •, যে য়ো • না• • • •

২´ ৩ • ১

I পা ৠজ্জা। -া -া -ঋা। -ৠজ্জা -াঋ। -সঋা -া -া II II

প্র ভু • • • • • •• • •

—•—

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(5)

48. The first whole-day Brahmotsava at Keshub's house—1867 A.D. November (1789 *Saka*, Agrahayana.)

About this time was celebrated for the first time the Brahma festival known by the name of Brahmotsava, literally meaning—"Rejoicing in the Lord." It took place about the end of November 1867 (Agrahayana, 1789 Saka) at Keshub Chunder's house. The following account of it is given in the *Indian Mirror* of the 1st July 1868, by P. C. Mozoomdar, in an article entitled "The Origin and advantages of the Brahmotsava":—"These special festivals usually commence at sunrise and last t.l late at night, and comprise, besides regular morning and evening services, intermediate ones for meditation, singing of hymns, the reading of religious texts, and conversation on spicial religious difficulties. Those Brahmas who desire to know what it is to *see* and *feel* God (we speak with the humble reverence of sinners) should come and attend one of the Brahmotsavas. The humility, the hope, the prayerfulness, reverence, love, faith and joy that flow in celestial currents at such times catch men's souls by a kind of holy contagion."

49. Introduction of *Nagar Sankirtan*—January 1870 A. D.

Miss Collet, in her sketch of the *Samaj*, gives a fuller description of this interesting festival, which we also append, as it may help to give a better idea of the devotional enthusiasm of Keshub's party. "The grace of the Heavenly Father, for which they had so long waited and watched, cried and contended, was now near at hand. Very dimly and vaguely at first, more distinctly and definitely afterwards, this was understood, continued and sincere repentance, heartfelt dependance, fervent supplication, constant and devout meditation, fastings and vigils followed. From weekly meetings daily meetings of devotion were held, songs expressive of the most lowly humility, most vivid faith and dependance, were sung in choral rapture, giving rise to that new hymnal service of the Brahmas called by the name of Brahma Sankirtan. Now for the first time in connection with the *Brahma Samaj* was witnessed the rare spectacle of sinful men, bitterly conscious of their sins, praying and listening with living sincerity for their soul's salvation. Could such prayers and precepts fail ? New strength, new hopes and joys, new harmony and light were obtaind from their new method of spiritual exercise. The past was greatly explained, the present was received with thanks-giving, the future was anticipated. With gratitude and lowliness of spirit did they rejoice, constautly praying all day without food and drink, singing their merciful Father's praise. And those who bitterly wept erewhile, who were so full of darkness, unholiness and untruths that hope had nearly left their hearts ; if such forlorn sinners find the direct dispensation of God to give them salvation and peace, have they not cause for grateful rejoicing ? Thus originated the Brahmotsava, the festival of the Brahmas. In the last few anniversary festivals, large bodies of Brahmas have gone out, threading the streets and lanes of the native quarter of Calcutta, singing missionary hymns to win their Hindu countrymen to the service of the one true God. This practice was first begun in January 1870 at the earnest instigation of Keshub Chunder Sen, who, after preaching a stirring sermon on the subject, headed the band of singers the same day."*

50. *Bhakti movement.*

The first noteworthy phase in the religious development of the *Samaj* of

* It should be mentioned here that street singing did not originate from Keshub Chunder. It originated with Chaitanya, the celebrated Vaishnava reformer of Bengal more then 300 years ago, and is still practised daily in the streets throughout Bengal by mendicants of that order, as also in their Nagar Kirtans.

India was what has been called the *Bhakti* movement. When Keshub and his followers abandoned the *Samaj* in 1863, they had but few prospects. On the one hand they had removed their church; on the other hand they were repulsed by their relatives and friends; difficulties and persecutions beset them on every side. In this state of distress they put their trust in the goodness of God to deliver them out of their troubles. This is what is meant by the term *bhakti*, which may be translated Divine love, loving faith in God, fervent devotion, and so forth, a doctrine somewhat similar to that preached in the New Testament.

51. Three Phases of the movement—Prayer, Sankirtan and Brahmotsava.

This internal faith of the new Brahmas developed itself successively with three outward forms of devotion. The first was prayer, the efficacy of which is thus described by Miss Collet: "Through the medium of prayer, through heartfelt communion with God, the spirits of these troubled and anxious men gained new life and strength, and this communion grew and developed so as to tansform the whole tone of their minds, and to elevate and enlarge the character of Brahmaism in a remarkable manner." The second was Sankirtan, or the use of songs of a religious nature, expressive of the most lowly humility, most vivid faith and dependance, which were rapturously sung in chorus, and gave rise to the introduction ever afterwards of a hymnal service. The third was *Brahmotsava*, which has already been described.

52. *Bhakti and Rationality.*

In considering whether the *bhakti* movement and its developements are consequences of Brahmaism, we find on examination that *bhakti* or blind faith is a doctrine quite unknown in the *jnan kanda*, or, rationalistic doctrines of the Vedanta. It is an element of the Vaishnava religion, and was first preached by Krishna to Arjuna, in order to convert him to a blind belief in his divinity. It was then revived in the beginning of the sixteenth century by Chaitanya, a pseudo prophet, at Nuddea, in Bengal, to impress on the minds of his followers a belief in his divinity.

53. The movement borrowed from Vaishnavism.

The doctrine of *bhakti* is contradistinguished from that of *jnana*, knowledge or rationality, treated of in Hindu philosophy as the only way to truth and to God. But *bhakti* or faith includes an assent which we give to a proposition advanced by another, the truth of which we do not perceive from our own reason and experience. It includes a judgment or rather an assent of the mind which is not so much prompted by intrinsic evidence as the authority or testimony of some other who reveals or relates it. The Bengali reformer maintained the pre-eminence of faith over *jnana*, knowledge, and *sraddha*, or veneration, over rational belief. He taught that all men are capable of participating in the sentiments of faith without knowledge or act of piety. His faith had developed itself into five forms, such as *Sakhya*, *Madhura*, &c., which we need not dwell upon here. He preached his new doctrines in the streets and villages of Nuddea, accompanied with *Sankirtans*, which gave the idea of walking through the streets of Calcutta singing to Keshub and his followers. The words faith, prayer, *Sankirtan* and *brahmotsava*, now in use among Keshub's followers, are evidently borrowed from the *bhakti*, *bhajan*, *sankirtan* and *mahotsava* of the Vashnavas of lower Bengal, and, far form being preached by Brahmas of ancient times, are utterly unknown to the people in every other province of India.

54. *Faith vs. Reason.*

Faith is defined by Coleridge to be the fidelity, the fealty of the finite will and understanding to reason. Faith is but another word for trust and confidence. Rationality is more necessary for the well-being of man than mere faith. For, says the truly catholic Brahma, "without knowledge religion is apt to degenerate into a blind, irrational and unregulated faith. It does in that case degenerate into fanaticism

on the one hand and superstition on the other. We owe the correct notions of the God-head, which form one of the chief glories of Brahma-dharma in contradistinction to other religions, to *jnana*, or knowledge, and it is ingratitude to represent it as totally harsh and dry. As flesh and blood only without bones cannot form a human body, so faith only, unaccompanied by knowledge, cannot form a true Brahmic state of the mind. We must show reasons for our faith when called upon to do so, and it requires knowledge to do so properly."*

55. Aim of the Adi Samaj—*Harmonising Jnan with Bhakti.*

In the beginning of the Brahma movement at the time of Raja Ram Mohun Roy sole stress was laid upon *jnana*, as there now is a tendency to lay too much stress upon *bhakti* or blind faith. Raja Ram Mohun Roy, in his "Tuhfat-ul-Muahhidin," protests against the *Momenin* or faithful, a title which Mussalmans assume to themselves for their *iman*, or blind faith in the *ipse dixit* of their prophets without sufficient *shahadat* or testimony or evidence. Granting, however, the necessity of faith as opening the fountains of pious feelings in our hearts, we should yet, says the *Adi Brahma*, remember that "Brahma dharma requires a harmonious combination of the two. Even purely secular knowledge should not be despised, considering its intimate connections with, and bearings upon, religion."†

56. Prayer as in the Hindu Sastras stretched to its utmost limit by Keshub Chander under influence of Christianity.

Let us now take into consideration the doctrine of prayer, the first result of faith, which we find from the beginning to be the sole hope and support of Keshub Chunder and his party. The word prayer (*prarthana*) is almost unknown in Hindu devotion, and its uselessness is derived by many Hindu philosophers and some Brahmas from the grounds of the immutability of divine decrees and the omniscience of God. Hindu devotion (*aradhana*) among the Brahmas of ancient India consisted of *jnana*, knowledge, *dhyana*, meditation, *bhajan*, adoration, *sadhyaya*, service, *bandana*, praise, *jags*, doxologies, *tap*, austerities, and some other ceremonies. Prayer however must be acknowledged to have been in use from the earliest times, both among *karmis* and *jnanis*, as we find in the Rigveda hymns and Upanishads, though it is not mentioned by name in Hindu liturgies, and was adopted by the new school of Brahmas that sprung up immediately after the death of Raja Ram Mohun Roy. Keshub has, however, under the influence of Christian ideas stretched the doctrine of prayer to its utmost length supplicating the deity not only for his aid in the paths of spiritual advancement, but for the expression of his will in the most trivial concerns of life, and for the attainment of success therein.

57. *Keshub-worship.*

We have now to consider another movement, which was no doubt a further development of the *Bhakti* movement. We allude to Keshub-worship or personal adoration of Keshub as a new deity or incarnation.

58. How far Keshub responsible for this ?

This subject has attracted, as well it may, universal attention, and opinions are very evenly balanced as to the culpability or innocence of Keshub Chunder in allowing so base a form of idolatry to be practised by his followers. At the time of its perpetration, so universal was the indignation against Keshub that it threatened to overthrow all his schemes for the reformation of his countrymen. The few histories which exist on the *Brahma Samaj* are not unanimous in their opinions on the subject. Miss Collet disposes of this important point in a few words, by expressing her opinion that it was an "unfounded calumny" and a "worn-out absurdity," and required no further elucidation. She further states that

* See Brahmic Questions of the Day.
† See Do Do

Keshub Chunder frequently expressed his disapproval and dislike of the practice of personal adoration of himself by his followers.

This statement is, however, distinctly contradicted in *Brahma Dharmer Uchcha Adarsa*, giving a detail of Keshub's conduct in this affair, where it is mentioned that Keshub tamely received these honors from a party at Monghyr on his return from Simla to Calcutta, without preventing or putting a stop to the practice, which led the people to believe that he was anxious to aspire to the honor of an incarnation. The *Itivritta* has treated the subject at great length, and has set forth the accusations made against Keshub, but has exculpated him from all blame.

There can be no denying that such a practice as "personal adoration of and prostration before Keshub" was in vogue among certain of the followers of the *Samaj* of India. But the cardinal point at issue is whether Keshub Chunder objected to the idolatrous practice, and exerted his authority as leader and Secretary to the *Samaj* of India to put an immediate stop to it? Let us briefly investigate the question.

হিন্দুসমাজসম্মিলন।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

গত ৩০শে মাঘ ও ১লা ফাল্গুন শনি ও রবিবার হিন্দুসমাজসম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন এবার ক্যানিং টাউনে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সম্মিলনে যোগদানের জন্য আহূত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজ ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্র-কুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল এবং পাণ্ডত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্যানিং কলিকাতা হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে সুবিস্তৃত মাতলা নদীর তীরে ই, বি, রেলপথের দক্ষিণ বিভাগের অন্যতম শাখা লাইনের শেষ ষ্টেশন। ইহা "পোর্ট ক্যানীং ল্যাণ্ড একুইজিসন কোম্পানী"র সুবিস্তৃত জমীদারীর সদর বিভাগ। এখানে তাঁহাদের দ্বিতল আফিস ও কুঠী বাড়ী প্রভৃতি অবস্থিত। ইহা ব্যতীত চারিধারে ধানজমির মাঠ ভিন্ন অন্য লোকের বসতি বড় নাই। এখানে একমাত্র ধান্য ব্যতীত অপর কোন দ্রব্য জন্মে না। সুতারং কলিকাতা ও সোনারপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ আমদানী করিতে হয়। প্রায় ৭০ বৎসর হইতে চলিল উক্ত কোম্পানী সুন্দরবন অঞ্চলের জমি গবরমেণ্টের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া উহা ভেড়ী বাঁধাদির দ্বারা সুরক্ষিত করতঃ জঙ্গল কাটাইয়া প্রজা বসবাস করাইয়া আসিতেছেন।

এই প্রজাসকল প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণী হইতে পরিপুষ্ট। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থে ও বিদ্যায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদেরই অন্যতম বয়োবৃদ্ধ রায় শ্রীধরণীধর সর্দ্দার মহাশয়ের যত্নে ও আনুকূল্যে ক্যানিংএর বারোয়ারীতলায় হিন্দুসমাজ-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ৩০শে মাঘ শনিবার বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় ক্যানিং ষ্টেশন হইতে সভাপতি উদারভাবাপন্ন ময়মনসিংহের মহারাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর মহোদয়কে বরণ ও পুষ্পাভরণ-ভূষিত করিয়া মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ও আনন্দসহকারে শোভা-যাত্রা পূর্ব্বক আমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর গোলকুঠী নামে প্রসিদ্ধ বৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

বেলা চারি ঘটিকায় সম্মিলনের অধিবেশন প্রধান মণ্ডপ বারোয়ারীতলায় আরব্ধ হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আলাপ ও আলোচনা দ্বারা পরস্পরের ভাববিনিময় ও পরিচয়-লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে স্পষ্টই অনুভূত হইয়াছিল যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার পন্থানুসরণ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের যে কল্যাণজনক সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই সেই কর্ম্মভার হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন স্কন্ধে বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

উপাসনামণ্ডপে সভারম্ভের পূর্ব্বে যে সার্ব্বজনীন ভগবদুপাসনা হইয়াছিল, উহার স্তোত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে গৃহীত হইলেও আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতিরই যে অনুসরণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্বামী সত্যানন্দ ও তাঁহার সহকারীগণকে ইঙ্গিত করিতে চাই যে, উক্ত "নমস্তে সতে তে" স্তোত্রের সহিত আদিব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে যজুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত "ওঁ পিতা নাহসি" এই সহজ অর্চ্চনামন্ত্রটীও ব্যবহৃত হইলে অধিকতর মনোগ্রাহী হইত মনে হয়।

সুপ্রাচীন হিন্দুসমাজ সেই আদিকালে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত হইয়া-

ছিল। আজ সেই ভিত্তি ভগ্ন হইলেও এখনও উহার কাঠামো খাড়া রহিয়াছে। ইহা যে কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি নিজ নিজ সমাজমধ্যে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ এবংবিধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা সহজেই দৃষ্ট হইতে পারে। ইহা মানব-সমাজমাত্রেরই প্রকৃতিসিদ্ধ। যে গুণকর্ম্মের বৈচিত্র্যের ফলে সমাজমধ্যে উচ্চনীচ শ্রেণীভেদ অবশ্যম্ভাবী, তাহা কখনও অমঙ্গলজনক হইতে পারে না। হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহাদিগকে উচ্চে উঠাইয়া লওয়া ঋষিপ্রদিষ্ট অনুশাসনের অনুগত এবং তাহাই সমীচীন মার্গ। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-মহোদয়ও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুসাধারণকে বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং তাহাদিগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের পথে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিয়া শ্রেয়স্কর পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ এই বিষয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কতদুর সুসঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। আমরা যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমানে অবলম্বিত পদ্ধতি কেবল বাহ্যিক বিষয় লইয়াই অনুসৃত হইতেছে, উহাতে গুণকর্ম্মের উৎকর্ষসাধনের প্রতি বিশেষ কোনই দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানে জন্মগত হিসাবে যাঁহারা উচ্চ জাতি বলিয়া গৃহীত হন, তাঁহাদের মধ্যে গুণকর্ম্মের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। সেই সকল জাতি যদি আপনাদের অধিকৃত উচ্চ আসন সংরক্ষিত দেখিতে চান, তবে তাঁহাদেরও নিজেদের মধ্যে গুণকর্ম্মের উন্নতি-সাধন অপরিহার্য্য।

কেবল বাহ্যিক আকারে প্রকারে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করিলে বোধ হয়, স্থায়ী সুফল পাইবার সম্ভাবনা অল্প। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, অন্ততঃ এই ভারতভূমিতে সমাজসংস্কারকে বেদ-বেদান্তপ্রতিপাদ্য উদারতম ও অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড় করাইতে পারিলে তবেই উহা স্থায়ী সুফল লাভ করিতে পারে। নতুবা কেবল বাহ্যিক সমাজসংস্কারের প্রতি ঝোঁক দিলে সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও বিরোধ-বিবাদের আধিক্যের সম্ভাবনা, ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বে সমাজসংস্কারের যে বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, হিন্দুমিশনের শুদ্ধি-পদ্ধতি, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যে তাহাই বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইতেছে দেখিতেছি। ইহা ব্যতীত শুদ্ধির বিস্তৃতি ও প্রসারের ফলে Hindu cultureএর বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ অবশ্যম্ভাবী এই কারণে হিন্দু মিশনের কার্য্যের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের দ্বারা এই প্রকারে সমাজসংস্কার সাধিত হইতে থাকিলে পরিণামে ইহা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না—কারণ আমরা হিন্দু এবং আমাদের প্রাণ ধর্ম্মগত।

ভেদ ও অভেদবুদ্ধি।*

(স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি)

[আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাধুসন্ন্যাসী মহলেও সমাদৃত হইতেছে। লেখক পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী ভোলানন্দ গিরির অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের মনোভাব কতকটা বুঝা যাইবে, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রবন্ধ আমরা সাদরে পত্রস্থ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমরা প্রবন্ধের সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারি নাই। লেখক গীতোক্ত সমত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার যে ত্রিগুণাতীত ভাব লইতে চাহেন তাহা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। তিনি গীতা হইতে এবিষয়ে যে ২।১টী স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ অর্থে অর্থাৎ চঞ্চল চিত্তকে সংযত করিয়া স্থৈর্য্যের উপর দাঁড় করাইবার অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের মতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণে মানবসন্তান যতই কেন উন্নত হউন না, কিছুতেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে পারেন না। যদি বা কেহ পারেন, তাহাও সোনার পাথর বাটীর ন্যায় আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বুদ্ধিভেদের অকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন বোধ হয় না। তাহা যদি হইত, তবে বিক্ষুব্ধচিত্ত কর্ম্মসঙ্গী অর্জ্জুনের বুদ্ধিভেদ ও জ্ঞানবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল, বলা যায় না। অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ অকর্ত্তব্য স্বীকার করিলে জগতের উন্নতি সাধন অসম্ভব হইবে। প্রবন্ধপাঠে আমাদের প্রাণে যে দুই একটী কথা উঠিল তাহা সরল-চিত্তে প্রকাশ করিলাম বলিয়া আশা করি, স্বামীজী কোন ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।] তঃ সং

আজকাল ভেদ বিদূরিত করিবার যে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে কয়টী কথা মনে উদিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। এ বিষয়ে সুধীগণ প্রকৃত সত্য নির্ণয়ার্থ স্ব-স্ব চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করিলে সুখের হইবে।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তিনগুণের বৈষম্যে সৃষ্টি এবং সমতায় অব্যক্তাবস্থা সাংখ্যাদি-দর্শনসম্মত। ঋগ্বেদেও দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে নাসদাসীৎ ইত্যাদি মন্ত্রে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে তম বা প্রকৃতি-

---

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী। তঃ সং

সমাগমে বিরাট পুরুষের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। একের সহিত তমের সংস্পর্শে যেমন বৈষম্যের সৃষ্টি ঘটে, তেমনি প্রকৃতির বিকার-জন্য মহদাদির উৎপত্তিতে বৈষম্যই ঘটে।

বর্ত্তমান যুগে একই ইলেক্‌ট্রনের কাঁপ, চাপ ও তাপের বৈষম্যে হীরা কয়লা স্বর্ণ রজতাদি ভাবোৎপত্তিও বৈষম্য বা ভেদসঞ্জাত। এ হেন অঘটন-ঘটনপটীয়সী প্রবলপ্রতাপশালিনী প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া সমতার আলাপন আলাপনমাত্রেই পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে এতই বৈষম্য যে, তাহা ধারণা করা সহজসাধ্য নহে। বৃক্ষ, লতা, ধাতু, অধাতু, সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ-বৃত্তি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সর্ব্বত্রই বৈষম্য। সকলের বৃত্তিভেদ থাকিতে অভেদ বা সাম্য-প্রচার একদা অসম্ভব। তাই সব সমাজে মিশনরী, মিলিটরী, মার্চ্চেণ্ট ও লেবার শ্রেণী পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষার তারতম্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। স্বল্পবুদ্ধিগণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবেই। পরিচালক ও পরিচালিতের ভেদ অনিবার্য্য। তমোবহুল কুম্ভকর্ণ, রজোবহুল রাবণ হইতে পারে না। তেমনি রাবণ সত্ত্ব-প্রধান বিভীষণ হইতে পারে না। তাহাদের খাদ্যাদিতে এবং আচারব্যবহারেও পার্থক্য থাকিতে বাধ্য। রাবণের মদ্যাদি খাদ্য সত্ত্বগুণাবলম্বীর খাদ্য হইতে পারে না।

দ্রব্যগুণের ক্রিয়া দেহাদিতে প্রকাশ পাইবেই। তাই সত্ত্বগুণের বিকাশ জন্য যিনি প্রস্তুত হইবেন, রজ-স্তমোগুণান্বিতের সংস্রব তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। রজস্তমোগুণীর আহার্য্য, আচার ও ব্যবহার ত্যাগ না করিয়া সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি করিতে যিনি প্রয়াসী হইবেন, তাঁহার সে প্রয়াস যে ব্যর্থ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে যিনি সত্ত্বগুণ লাভানন্তর আরও সাধনপথে অগ্রসর হন, তিনি ত্রিগুণাতীতে তমর পরপারে বা ত্রিফলা-ধারিণী প্রকৃতির শিরে দাঁড়াইয়া সমতার বংশীবাদন করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

যতক্ষণ সমাজসংসার, ততক্ষণ ত্রিগুণাধীন—ভেদবর্জ্জন কথার কথা। যখন ত্রিগুণাতীতে তখন অভেদই অভেদ। স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদত্রয়ের সেথানে স্থান নাই। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" "সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে" "শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" এই সমাজসংসারে ভেদবর্জ্জনের অসম্ভবতা অবলোকনেই ভগবান "ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" ইত্যাদি বলিয়াছেন। গুণভেদে বুদ্ধিভেদ, বুদ্ধিভেদে কর্ম্মভেদ, কর্ম্মভেদে আচার-ব্যবহার ভেদ হইয়া জাতিবর্ণভেদের সৃষ্টি করে। এজন্য সমতার প্রচারের পূর্ব্বে প্রচারক স্বয়ং ত্রিগুণাতীত সাম্যে স্থিতবান হইবেন। "আপনি আচারি কর্ম্ম জীবেরে শিখায়" বাক্য প্রতিপালন করিলে কথঞ্চিৎ মঙ্গল হইলে হইতে পারে। সমবুদ্ধি চিত্তে জাগান ও সমত্বমূলক আচার ব্যবহারে সর্ব্বত্র একাকার জন্য প্রচেষ্টা করা সমীচীন কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত শিক্ষা।

শিক্ষা মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কতকগুলি শক্তি নিহিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার কতকটা অভিব্যক্তি বা স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষকে যদি বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সেই অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি সম্যক্ ভাবে বিকশিত করিয়া তোলা সম্ভবে না। বাল্যকালই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। বালক যখন বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার কোন্ দিকে ঝোঁক অধিক, তাহা বেশ বুঝা যায়। যাঁহারা শিক্ষা বিভাগে মনোযোগের সহিত কাজ করিতেছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, শৈশবে ছাত্রদিগের এই মনের ঝোঁক বেশ ধরা পড়ে।

একই সমাজের ব্যক্তিভেদে যেমন তাহার শক্তির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ একই মানব-জাতির অন্তর্নিহিত জাতিভেদে সেইরূপ প্রকৃতির তারতম্য লক্ষিত হয়। য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে যে, জাতি হিসাবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতিগত তারতম্য অত্যন্ত অধিক। সহসা আমরা তাহা ধরিতে পারি না সত্য,—কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে উহা লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে ধরা পড়ে। একজন জার্ম্মাণের, একজন ফরাসীর এবং একজন ইংরাজের জাতিগত চরিত্রের পার্থক্য যে অনেক আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার এবং সামাজিক ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যকে পরিহার করিয়া চলা সম্ভবে না। শিক্ষার ব্যবস্থাতেও এই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা যদি করা না হয়,—অন্যের অনুকরণে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজাতীয় ভাবে পরিকল্পিত হয়,—তাহা হইলে সেই শিক্ষার ফলে এক একটা জাতির যে জাতীয়তা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের প্রতিভা মনীষা প্রভৃতি লোপ পায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন করিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয় শিক্ষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জাতিগত মেজাজ বা ধাতুপ্রকৃতি (Temperament) যে কৌলিক অবদানপরম্পরার এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শক্তির বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে, প্রত্যেক জাতির পূর্ব্বজগণের অবদান-পরম্পরা তাহাদের প্রকৃতিতে যে ভাব অত্যন্ত গভীর-ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়া ফেলা যায় না। উহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। যে জাতি যত অধিক দিন কোন একটা বিশিষ্ট সভ্যতার ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া আসিতেছে, সেই জাতি ততই একটা জাতীয়-ভাবে গঠিত হইয়া উঠে। তাহার জাতীয়তার ছাপ তাহার চরিত্রে বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য তাহাদের অতীত অবদানপরম্পরা জানা তাহাদের

পক্ষে অতিশয় আবশ্যক। একজন গভীর চিন্তাশীল ইংরাজ দার্শনিক লিখিয়াছেন—

The problem of heridity is that on which medical and social work must alike rest. An examination of this subject shows that the individual cannot be modified by this environment, and therefore the all-important question to consider is the national power of the individual, and to determine what relation the environment has to the type or types existing under it. Temperament is, therefore, the fundamental basis of the sociologist.

অতএব ব্যক্তিগত স্বাভাবিক শক্তির এবং নৈসর্গিক আবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত মানবমণ্ডলীর সহিত সেই নৈসর্গিক আবেষ্টনের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক অবধারণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অতএব মেজাজ (জাতীয় ও ব্যক্তিগত) সমাজবিজ্ঞানবাদীর কার্য্যের মূলভিত্তি।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অতীত সাধনার যে শক্তি বীজাকারে আমাদের ধাতুপ্রকৃতিতে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাই আমাদের কৌলিকতা। উহা আমাদের স্কন্ধে এরূপভাবে ভর করিয়া আছে যে, আমরা ইচ্ছা করিলেও উহা আমাদের স্কন্ধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব না। আজকাল কেহ কেহ অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন। সেই অতীতে যে আমাদের অস্তিত্বের মূল নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না।

আমাদের অতীত ভাষা সংস্কৃত। ভারতে যত ভাষা আছে,—তাহার প্রায় সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষাতেই আমাদের অতীত পুরুষপরম্পরায় অবদানপরম্পরা এবং কীর্ত্তিকলাপ লিখিত আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় জানিতে হইলে তাহা সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই জানিতে হইবে। অন্যথা তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। এমন কি তাঁহারা যেখানে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন,—সেখানেই বা কি ভাবে তাঁহাদের সেই প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও আমাদের জানা উচিত। সংস্কৃত ভাষাই আমাদের সেই অতীতের সহিত পরিচিত করিবার একমাত্র সম্বল। সুতরাং আমাদের সেই ভাষার সহিত পরিচিত হইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সংস্কৃত ভাষাকে তাঁহাদের পাঠ্যতালিকা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা আপাততঃ ঐ ভাষা শিক্ষাকে ছাত্রদিগের ইচ্ছাধীন করিয়া দিয়াছেন (?) ইংরাজ জাতি তাঁহাদের শিক্ষাতালিকা হইতে ল্যাটিন বা গ্রীকভাষা বাদ দিতে পারেন,—কারণ, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের ভাষা নহে। ইংরাজ রোমক বা গ্রীকদিগের বংশধর নহেন। তাঁহাদের কৌলিক অবদান ল্যাটিন বা গ্রীকভাষায় লিপিবদ্ধ নাই। সুতরাং তাঁহারা সেই প্রাচীন ভাষা অনায়াসেই বর্জ্জন করিতে পারেন। অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের অতি প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালার যে সম্বন্ধ, অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষার সহিত তাঁহাদের ইংরাজী ভাষার সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং ইংরাজ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা স্বেচ্ছাধীন করিতেছেন বলিয়া আমাদিগকেও যে তাহা করিতে হইবে, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে।*

শোকসংবাদ।

রায়বাহাদুর ৺মনোরঞ্জন মল্লিক।—ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র রায় বাহাদুর ৺মনোরঞ্জন মল্লিক মহাশয় গত ২০শে মাঘ বুধবার মধ্যরাত্রে তাঁহার ভবানীপুরের বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে বার্দ্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। "কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ট্রিবিউনালের" প্রারম্ভ হইতে তিনি উহার সরকারপক্ষের উকিলের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমৃত্যু বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া প্রভূত যশ ও অর্থলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। দুই বৎসর গত হইল, আমরা আমাদের পরম বন্ধু শিতিকণ্ঠ বাবুকে হারাইয়াছি। এত শীঘ্র তাঁহার পুত্রকেও যে হারাইতে হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পিতার মৃত্যুর পরে মনোরঞ্জন বাবুই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একরূপ কর্ণধার হইয়াছিলেন। এখন তাঁহারও মৃত্যুতে ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। মনোরঞ্জন বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগকে তাঁহাদের এই প্রগাঢ় শোকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺স্বর্ণলতা রায়চৌধুরী।—কটকের "Star of Utkal" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী ৺স্বর্ণলতা রায়চৌধুরী মহাশয়া গত ১৪ই ফাল্গুন শনিবার তাঁহার কটকের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি আসামের খ্যাতনামা রায়বাহাদুর ৺গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। আসামবাসিনীগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে উচ্চশিক্ষালাভের খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আসামী ভাষায় গ্রন্থরচনার খ্যাতিও তিনি যথেষ্ট অর্জ্জন করেন। ভারতীয় সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারে তিনি অগ্রণীগণের মধ্যে অন্যতমের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন বিদুষী ও কর্ম্মনিপুণা মহিলাকে হারাইয়া দেশ সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত সুযোগ্য পুত্রকন্যাদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদগতিবিধান করুন।
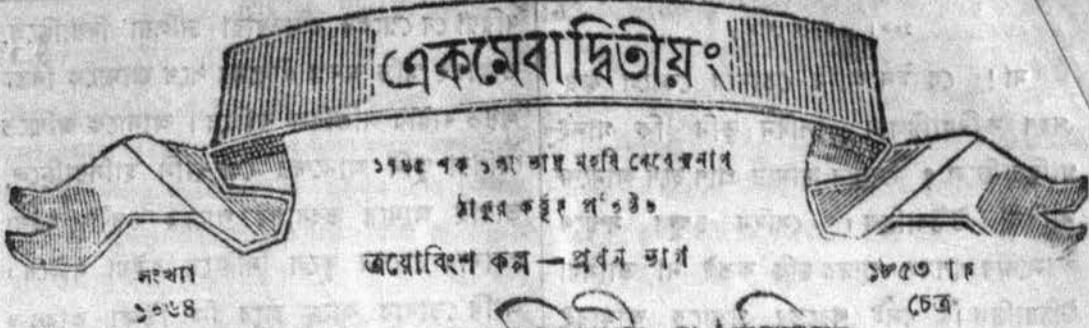
---

* বসুমতী ২৬শে বৈশাখ ১৩৩৮।

ওঁতৎসৎ

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৮। আঁধারে আলো।

মা! সময়ে সময়ে তুমি কেন কি কর, কিছুই বুঝিতে পারি না। তখন প্রাণের ভিতর কেমন এক সংশয় আসে, তুমি আমাকে ভালবাস কিনা, স্নেহ কর কিনা। সেই সময়ে ইচ্ছা করে মন-প্রাণ সমস্তই উপাড়িয়া ফেলিয়া তোমার চরণে দিয়া দেখাই যে তোমাকে পাইবার জন্য, তোমার চরণে একটুখানি বসিবার অধিকার পাইবার জন্য, আমার প্রাণের ভিতর কি রকম রক্তারক্তি হইতেছে। তুমি চকিতে আস, আর চকিতের মত দেখা দিয়া চকিতে চলিয়া যাও—কেন? আমার প্রাণে এমন কঠিন আঘাত দিয়া তোমার কি লাভ হয় তাহা বলিতে পারি না। তোমার ঐ একটুখানি দেখা পাইয়া, ঐ একটুখানি আদর পাইয়াই তোমার আরও দেখা পাইবার জন্য, আরও স্নেহ-প্রেম পাইবার জন্য আমি যে পাগল হইয়া গিয়াছি—দিনরাত্রি যে কখন্ আসে আর কখন্ যায়, কিছুই জানিতে পারি না। আমার গানের উৎস থামিয়া গিয়াছে, আমার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, আমার প্রাণের খেলা থামিয়া গিয়াছে। জননী! তোমার সেই অপরূপ রূপের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দিনরাত্রি আমার নয়নের সম্মুখে ভাসিতেছে। আমি আমার চারিদিকে তোমারই মূর্ত্তি দেখিতেছি; তোমার ঐ মুখের সুমিষ্ট হাসিই আমাকে সংসারের দুঃখসাগরেও শান্তিতরীতে ভাসাইয়া রাখিয়াছে। আহারনিদ্রা সকলই ছাড়িয়াছি, পাছে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য তোমার সেই মূর্ত্তি দৃষ্টিবহির্ভূত হয়। সূর্য্যের পশ্চাতে তোমারই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখি; চাঁদের পশ্চাতে তোমারই স্নেহের সুধামাখা মূর্ত্তি দেখি। লোকদের কর্ম্মের পশ্চাতে তোমারই আনন্দমাখা মূর্ত্তি দেখি। চারিদিকে সর্ব্বদা তোমারই চরণধ্বনি শুনিতে পাই—সর্ব্বদাই মনে হয়, তুমি নীরব চরণে আমার এই আঁধার ঘরে আসিতেছ। দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে—সকল দিক হইতেই তোমারই আহ্বানবাণী আসিয়া কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি—আমার এই আঁধার ঘরে আসিয়া যদি বারেকের জন্যও দেখাই দাও, তবে আর আমাকে ছাড়িয়া গিয়া আমার ঘরটাকে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে দিও না।

১০১। জনমে যোগ।

মা! যে দিন আমি তোমার কোলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেদিন তুমি কি গানই গাহিয়াছিলে? সেদিন আমার প্রাণ হর্ষে আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন চক্ষুর সম্মুখে আনন্দের শ্যামল সুন্দর ছবি কতই না ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেই শরতের প্রভাতে আমারই মুখে একটুকু হাসি আনিবার জন্য কনকতপন গগনপটে কি সুন্দর চিত্রই না আঁকিয়া দিয়াছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের আনন্দনির্ঝরসকল শতধারে উৎসারিত হইয়া আমার মস্তক অবধি সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া আমার মনে প্রাণে নববল, দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। তুমি তোমার স্তন্যদানে আমাকে তোমার বীর্য্যে তোমার তেজে শক্তিময় করিয়া তুলিয়াছিলে। সেদিন তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গে যে সুগন্ধ মাখাইয়া দিয়াছিলে, তাহার সুবাসে সমস্ত গৃহ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমাকে নবাগত অতিথির আদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য যাঁহাদিগকে তুমি আহ্বান করিয়াছিলে, আমার দেহের সুবাস তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তোমার যে অনিমেষ মঙ্গল-দৃষ্টি আমাকে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই দিন—সেই জন্মিবার দিনই তোমার সেই দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টিকে একযোগে বাঁধিয়া দিয়াছিলে; সে বাঁধন আজ পর্য্যন্ত খোলে নাই, আর কখনও খুলিবে না। সেইদিন তুমি যে গান গাহিয়া আমার চক্ষে নিদ্রা আনিয়া দিয়াছিলে, সেই গান নিদ্রার ছলে প্রাণের ভিতর মহা জাগরণই আনিয়া দিয়াছিল—সমস্ত জীবন তোমারই চরণের অভিমুখে ফুটিয়া উঠিল। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, জীবনকোরকের এক-একটী পাতা ততই বিকশিত হইতে লাগিল। জননী! আমার আর কোনই সম্বল নাই; সেই পাতাগুলি যেমন পাইয়াছি, ভালই হৌক আর মন্দই হৌক, তাহাই তোমার চরণে নিবেদন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি, জীবনে শান্তি পাইয়াছি। সেইদিন—সেই জন্মিবার দিন তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া তোমার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া যে স্নেহের অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছিলে, তাহারই স্মৃতি অনন্ত জীবনের পথে আমাকে নিত্য অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিবে। আমাকে জন্মিতে দেখিয়া তুমি আনন্দের যে হাসি হাসিয়াছিলে, তাহাই আমার ভবসাগর পারের তরণী হইয়া তোমার চরণের কূলে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবে। আমি তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা করিব? তুমি তোমাকে আমায় দাও আর নাই দাও, আমাকে তোমার সঙ্গে এমন একযোগে বাঁধিয়া লও, যেন সে বন্ধনের গ্রন্থি সারাজীবনে না খুলিয়া যায়। তোমার কোলেতে আমাকে তুলিয়া লও; তোমার বক্ষে আমাকে জাপটাইয়া ধর। তোমার ভিতরে আমায় নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিতে দাও। তোমাতে আমি আর আমাতে তুমি—তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—জননী আমার! মা আমার! তোমাতেই ডুবিয়া যাই—নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

ধর্ম্মধারা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৫। বুদ্ধদেব ঈশ্বরে অনাস্থাবান্ ছিলেন না।

তথাগত বুদ্ধদেব সে সময়ের ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অন্তরে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। তাই তিনি জনগণকে অধর্ম্ম্য আচারব্যবহার হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ উপদেশদান ও প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, অধর্ম্মের পথে চলাই মানবের সকল দুঃখ ও সকল ক্লেশের মূল; তাই তিনি সেই দুঃখ ও ক্লেশের মূল অধর্ম্মকেই সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বৈদিক ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ যে ঈশ্বরের নামে অধর্ম্মের ভীষণ স্রোত তদানীন্তন সমাজে প্রবাহিত হইয়াছিল, বুদ্ধদেব সেই ঈশ্বরের নাম প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করিয়া নবতরভাবে গণ্ডগোল আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাই তাঁহাকে ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে কেহ কোন প্রত্যক্ষ প্রশ্ন বা leading question করিলে তিনি নীরব থাকিতেন।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে আমরা নাস্তিক বা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আস্থাহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। সহজ দেশীয় চলিত ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ করিয়া, অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিনি তাঁহার হৃদয়ের যে তেজস্বিতা, যে নির্ভীকতা, যে অসমসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সত্যই যদি তাঁহার ঈশ্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস না থাকিত, তবে তিনি তাহা প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে তাহা ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৬। উহার নিদর্শন।

ভগবান বুদ্ধদেব কঠোর সাধনের বশে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার তত্ত্ব আবিষ্কারসূত্রে সমস্ত কার্য্যকারণের মূল কারণ পরব্রহ্মের ও আত্মা প্রভৃতির সন্ধান যে পান নাই, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। প্রত্যুত, তেবিজ্জসূত্রে উল্লিখিত বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথন পাঠ করিলে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, অশ্রদ্ধাবান হওয়া দূরে থাক, বুদ্ধদেব ভগবানে পরম ভক্তিমানই ছিলেন। বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথনে ভগবান বুদ্ধদেব বশিষ্ঠের মুখ হইতে ব্রহ্মের উপনিষদুক্ত স্বরূপই প্রকাশ করাইয়া লইলেন—মনুষ্যের ন্যায় ব্রহ্মের ধনসম্পত্তি বা স্ত্রীপুত্র-পরিবার নাই; ব্রহ্ম কাম-ক্রোধে বিচলিত হন না; তিনি দ্বেষ-হিংসার, মদমাৎসর্য্যের ও আলস্যের অতীত; এবং তিনি সংযমী অর্থাৎ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ও পবিত্রস্বরূপ। তাঁহার সমসাময়িক অধিকাংশ ব্রাহ্মণ যে কিরূপ ষড়রিপুর বশীভূত ছিল, তাহা বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথনে প্রকাশ পায়। ভগবানের নামে, ধর্ম্মের নামে ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের অধর্ম্ম্য আচরণ, তাহাদের আচারব্যবহার বুদ্ধদেবের এতই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রকৃতি বিষয়ে ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের প্রশ্নসমূহের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেন যে, ঐ সকল প্রশ্নোত্তরের খেলায় সময় কাটাইবার অবসর তাঁহার নাই এবং তাহাতে সময় কাটাইবার জন্য কাহাকেও উপদেশও দিতে পারেন না; তৎপরিবর্ত্তে তিনি প্রত্যেককে দুঃখনিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মঙ্গলসাধনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। বুদ্ধদেব সত্য সত্য নিরীশ্বর কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলে হিন্দুদিগের মধ্যে অন্যতর অবতাররূপে পূজিত হইতে পারিতেন না।

১৭। বুদ্ধদেব সমগ্র জগতের দীপ্তদীপ।

বুদ্ধদেবের ন্যায় ভক্তিবীর ও কর্ম্মবীর কেহ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি সার এডুইন আর্ণল্ডের পদানুসরণে খ্রীষ্টানগণ বুদ্ধদেবকে The Light of Asia বা মাত্র এসিয়া ভূখণ্ডের দীপ্তদীপ বলিয়া উল্লেখ করেন; এবং যীশুখৃষ্টকে The Light of the World বা সমগ্র জগতের দীপ্তদীপ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই দুইজন ধর্ম্মবীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে বা অশ্রেষ্ঠ, তাহার বিচার এস্থলে করিতে চাহি না, আমার পক্ষে তাহা করাও ধৃষ্টতা হইবে। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ভগবান তথাগত বুদ্ধদেব শুধু এশিয়া নহে, কিন্তু সমগ্র ভূখণ্ডেরই পথপ্রদর্শক দীপ্তদীপরূপে জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছেন এবং চিরকাল থাকিবেন।

১৮। বুদ্ধদেবের কর্ম্মবাণী।

প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইহা গৌরবের কথা যে, এই প্রাচ্য ভূখণ্ডেই বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতের ইহা গৌরবের কথা, হিন্দু জাতির ইহা গৌরবের কথা যে, বুদ্ধদেব এই ভারতভূমিতে হিন্দুজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দু সভ্যতার মধ্যে লালিতপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই ভারতভূমিতে তথাগতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রথম এই ভারতভূমিতেই তাঁহার কর্ম্মবাণীর বিজয়বিষাণ বাজাইয়া সমগ্র জগতের প্রাণে সাড়া আনিয়া দিয়াছিলেন। ইহা তো জানা কথা যে, প্রত্যেক মহাপুরুষই একএকটী বিশেষ বাণী লইয়া অবতীর্ণ হন। সেই বাণীই তাঁহার সমস্ত জীবনে যেন মিশিয়া যায়; সেই বাণীই তাঁহার জীবনের প্রতি কার্য্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতে চায়। যে মহাপুরুষের আবির্ভাবকালে যে অন্যায়ভাব, যে অসদাচার অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উঠে, প্রকৃতির নিয়মবশেই সেই অন্যায় ভাবের, সেই অসদাচারের বিরুদ্ধে মানবহৃদয় বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। শতসহস্র মানব হৃদয়ের সেই বিদ্রোহী ভাব যখন জাগিয়া উঠিয়া মানবসমাজকে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়া তোলে, তখনই সেই বিদ্রোহী ভাব সংহত হইয়া এক মহাপুরুষের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়, এবং সেই বিদ্রোহের ধ্বনিই সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে তাঁহার বাণীরূপে নির্গত হয়। ইতিহাস যে সকল সময় উহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে তাহা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের কর্ম্মবাণী নিনাদিত হইবার কারণেই আমাদের অনুমান হয় যে, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে,জানি না ঠিক কি কারণে, ঘোর আলস্য এবং তাহার নিত্য সহচর অনুচর হিংসা, নিষ্ঠুরতা, কদাচার প্রভৃতি অসদ্ধর্ম্মের শতবিধ অঙ্গ দেশের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সমাজ যখন অসদ্ধর্ম্মের এই সকল অত্যাচার অসহ্য বোধ করিতে লাগিল, তখনই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সমাজের প্রতি

যায়; যখন আলস্য পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মের অভিমুখীন হইবার জন্য অন্তরে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, তখনই সেই আগ্রহ পুঞ্জীভূত হইয়া সংহত আকারে বুদ্ধদেব প্রচারিত কর্ম্মবাণীর ধারায় সমাজের তপ্ত দেহে শান্তি আনয়ন করিল।

১৯। বুদ্ধদেব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে নীরব কেন?

বুদ্ধদেব যাহা প্রচার করিলেন, তাহার মূল কথা এই—"ঠিক মতে ভাবনা করিতে, ঠিক কথা বলিতে, এবং ঠিক পথে চলিতে শিক্ষা কর, ক্লেশের মূল অন্বেষণ কর, এবং উহার মূলোচ্ছেদ করিবার বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহা অবলম্বন করিয়া ঐকান্তিক দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভ পূর্ব্বক নির্ব্বাণমুক্তি লাভে কৃতার্থ হও।" ইহা ব্যতীত অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিয়া পরিচিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকিলেন। বুদ্ধদেবের প্রতি বশিষ্ঠের প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে কূটতর্ক এবং সেই কূটতর্ক লইয়া বৃথা বাদবিসম্বাদ সে সময়ে দেশের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃথা বাদবিতণ্ডার হাত হইতে নিজেও রক্ষা পাইবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণ-কেও রক্ষা করিবার জন্য অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রকাশ্য আলো-চনা হইতে তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত হইলেন। যে দ্বন্দ্ববিবাদের ভয়ে বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা দেশ হইতে ধর্ম্মনামীয় যাহা কিছু সমস্তই নির্ব্বাসিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; যে বিরোধ আসিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাপত্রে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব-বোধে বন্ধ হইয়া গেল, সেই দ্বন্দ্বকলহ, বিরোধবিবাদ আসিবার আশঙ্কাতেই শান্তির অবতার কারুণ্যরসের সাক্ষাৎমূর্ত্তি, আত্মনির্ভরের আধার তথাগত বুদ্ধদেব আত্মতত্ত্ব লইয়া তর্কবিতর্ক করা মোটেই পছন্দ করিলেন না।

২০। বুদ্ধ পূজা।

কর্ম্মবাদী বুদ্ধদেব আত্মনির্ভরের উপর জনসাধারণকে অতিরিক্ত আস্থাশীল করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, তাঁহার বিশুদ্ধ কর্ম্মবাদ প্রচারের ফলে জনসমাজ হইতে পূর্ব্বের আলস্য, হিংসা, মিথ্যা প্রভৃতি অধর্ম্মের অনেক অংশ অনেকটা বিদূরিত হইল সত্য; কিন্তু সর্ব্বদর্শী ভগবান তাঁহাকে ডাকিবার যে ইচ্ছা, তাঁহাকে ডাকিবার ও পূজা করিবার যে প্রবল আকাংক্ষা মানবহৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সে ইচ্ছা, সে আকাংক্ষা এই কর্ম্মবাদের ফলে কিছুমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারিল না। অথচ তাহা নির্ব্বাপিত করিবার শক্তিসামর্থ্যও কাহারও নাই। তাই বুদ্ধদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব যেমন যেমন অন্তর্হিত হইতে লাগিল, তাঁহার শিষ্যদিগেরও অন্তরে অল্পে অল্পে সেই স্বাভাবিক আকাংক্ষা ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। ঐ প্রাণের সহজ আকাংক্ষা চরিতার্থ করিতেও হইবে, অথচ বুদ্ধদেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা হইতে দূরে থাকিতেও হইবে; কাজেই বুদ্ধশিষ্যেরা নানা উপায়ে আপনাদিগের মন ভুলাইয়া ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া বুদ্ধদেবেরই মূর্ত্তি গঠন-পূর্ব্বক তাহারই পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্যানী বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ, আদি বুদ্ধ প্রভৃতি শতবিধ বুদ্ধের আকৃতি গঠিত হইয়া বৌদ্ধদিগের পূজা পাইতে লাগিল। শুধু বুদ্ধশিষ্য কেন, বুদ্ধমূর্ত্তিসকল বুদ্ধশিষ্যদের বাহিরেও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তদানীন্তন শিব প্রভৃতি অন্যান্য প্রচলিত দেবতাদিগের মূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল এবং বৌদ্ধদিগের পূজিত ধর্ম্ম প্রভৃতিও জন-সাধারণের পূজার পাত্র হইয়া উঠিল। ইহারই ফলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চারিদিকে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার লীলা ও উপদেশাদি চিত্রে চিত্রিত ও প্রস্তরে খোদিত হইয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিবার আকাংক্ষার এবং বিশেষভাবে বৌদ্ধদিগের ভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। ইহারই ফলে অজন্তা গুহা প্রভৃতি স্থানের অনুপম কারুকার্য্যে ঐ অনন্যপূর্ব্ব ভক্তিই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতবাসীর পূজা আহরণ করিতেছে।

২১। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জীব ব্রহ্মের ঐক্যবাদ।

এইরূপে বুদ্ধশিষ্যদিগের অতিপ্রাকৃতের সহিত যোগসাধনের আকাংক্ষা কিয়ৎপরিমাণে পরিতৃপ্ত হইলেও সম্যক চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। এই আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন এক সময় আসিল, যখন ইহা সমগ্র জনসমাজের প্রাণ ভেদ করিয়া বাহির হইতে চাহিল; ইহার চরিতার্থতাসাধনের জন্য অপেক্ষা করা, কালবিলম্ব লোকের আর সহ্য হইল না। তখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য আপনার ভিতরে জনসমাজের ঐ আকাংক্ষাটিকে সংহত আকারে নবতরভাবে গড়িয়া লইয়া প্রকাশ করিলেন। বেদান্তদর্শন প্রকটিত হইল। ভগবানের নাম আবার দেশময় ধ্বনিত হইতে লাগিল; জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন হউক না কেন, আপাতত জনসাধারণের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত কিন্তু সৃষ্টির অতীত পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিবার প্রাণের আকাংক্ষা চরিতার্থতালাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিল; ইহাতেই জনসমাজের সুখ হইল, জনসাধারণ একটা মহাশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং হউন, অথবা

তাঁহার শিষ্যগণই হউন, বৌদ্ধদর্শন সাংখ্যদর্শন এবং আদিমতম বৈদিকশাস্ত্রসমূহের মত, এই সকলকে এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে মিলিত করিয়া তাহার উপরে ব্রহ্মনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে বৈদিক মতেরই নবতর ও শেষ আকার বা last phase বলিয়া বেদান্ত দর্শনের নামে উহা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে হয়, ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার দর্শনপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের দেশীয় প্রচলিত ভাষাকে স্বমতের বাহনরূপে গ্রহণ করিবার কথা শোনা যায় না। এই কারণে দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম পণ্ডিতেরাই তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন, এবং উহাই পরে চুয়াঁইয়া চুয়াঁইয়া দেশময় বিস্তৃত হইল এবং জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। যেমন বুদ্ধদেব তাঁহার কর্ম্মবাণী প্রচারকালে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ দূরে সরাইয়া রাখিবার ফলে তাঁহার কর্ম্মবাদ নিরীশ্বর বলিয়াই বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইল, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার বাণীপ্রচার কালে উপনিষদের "সোঽহং" প্রভৃতি কয়েকটী বচনের উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক দিবার ফলে তাঁহার মতবাদ জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক বলিয়াই প্রচারিত হইল। প্রকৃতপক্ষে আমার মতে কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভক্তিবাদ প্রচার করাই শঙ্কাচার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ঘটনাচক্রে তাঁহার মত "মায়াবাদ"কে বলিতে গেলে নিছক জ্ঞান, যুক্তি ও তর্কের উপরেই দাঁড় করাইতে হইল, এবং ঈশ্বরকে বাদ দিলে, বৌদ্ধমতের পরিণাম এবং মায়াবাদের পরিণাম এমন পরস্পরে জড়াজড়ি হইয়া পড়িল যে, কিছুকাল যাইতে না যাইতে, সাধারণের ধারণা হইল যে, মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত এবং উহার পরিণাম ফল ভয়াবহ।

২২। মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত।

যতদূর বুঝা যায়, বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা হইতেই মূর্ত্তিপূজার বীজ এদেশে প্রোথিত হইল। এই মূর্ত্তিপূজার বীজ প্রোথিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবনতিরও বীজ স্বভাবতই রোপিত হইল। স্বভাবতই লোকদিগের মনে ক্রমশঃ এই ভাব স্থায়িত্ব লাভ করিতে লাগিল যে, দোষ করি, পাপ করি, সে সমস্তই ঐ মূর্ত্তিপূজার ফলে ক্ষালিত হইবে। অপরদিকে, মায়াবাদ অতিরিক্ত প্রচারিত হইবার ফলে অদৃষ্টবাদ আসিয়া দেখা দিল, জনসাধারণ কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান চক্ষের অন্তরালে রক্ষা করিতে শিক্ষা করিতে লাগিল ; লোকেরা সকলই মায়া, সকলই অদৃষ্টের দোষ, এই প্রকার স্তোকবাক্যে নিজেদের মনকে ভুলাইয়া রাখিয়া পাপের পথে অসদাচারে ডুবিতে লাগিল। এই প্রকারে বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ, বুদ্ধমুর্ত্তির পূজা প্রভৃতি, মায়াবাদ অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি শঙ্করপ্রচারিত মত ও তদনুবর্ত্তী শিষ্যানুশিষ্যদিগের নব নব মতবাদসকল মিলিত হইয়া দেশকে অধোগতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। যখন দেশ অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে, এবং ঐ সকল মতবাদের পরিণাম-ফল যখন দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণের নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনই শাঙ্কর মতবাদ ব্রহ্মের নামে আচ্ছাদিত হইলেও তাঁহারা উহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া পরিত্যাজ্য ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

২৩। ভক্তিভাবের অভিব্যক্তি।

শাঙ্কর মতবাদের, মায়াবাদের বিরুদ্ধে তখন দ্বৈতবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। জনসাধারণ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না, সেশ্বর বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। তাহারা এমন মতবাদ চাহিতে লাগিল, যাহাতে মানুষকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে শিখাইতে পারে, যাহাতে মানুষ ভগবানকে দুটো প্রাণের কথা বলিয়া তৃপ্তিবোধ করিতে পারে। দ্বৈতবাদমূলক নানাবিধ দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। মায়াবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জনসমাজের মনপ্রাণ ভগবানের সঙ্গে যোগসাধনের উদ্দেশ্যে এতই আকুল হইতে লাগিল যে, তাহারা দ্বৈতমূলক মতবাদ, দ্বৈতভাবের কথা, ভগবানের নিকট প্রার্থনার সপক্ষ বাণীসকল আরও—আরও—আরও চাহিতে লাগিল। তখন রামানুজ প্রভৃতির দর্শনমত সকল সমুদিত হইয়া ভক্তিমার্গের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। হিমালয় হইতে নির্ঝরিণী যেমন ক্ষুদ্র আকারে বিনির্গত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে করিতে সুপ্রশস্ত নদীর আকারে প্রবহমান হইয়া চতুঃপার্শ্ব শ্যামলতায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভক্তিবাণীও সূক্ষ্ম আকারে বহির্গত হইয়া ক্রমশ বলসঞ্চয়ে ঘনীভূত হইতে হইতে চৈতন্যদেবের সময়ে বন্যার আকারে সমগ্র ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিল।

২৪। দেশজ ভাষায় ভক্তিতত্ত্বের প্রচার।

বৌদ্ধদর্শন যেমন নিছক কর্ম্মসাধনের উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক দিয়াছিল, শঙ্করের বেদান্তদর্শন বা মায়াবাদ যেমন অতিমাত্রায় জ্ঞানসাধনের উপর ঝোঁক দিয়াছিল, চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ সেইরূপ অতিমাত্রায় ভক্তিসাধনের উপর ঝোঁক দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের সময় দেশজ ভাষারই ভিতর দিয়া

ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য চলিয়াছিল; মায়াবাদের অভ্যুত্থানের সময় সংস্কৃত ভাষারই ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা চলিয়াছিল; চৈতন্যদেবের সময়ে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার সামান্য সাহায্য লইলেও আবার দেশজ ভাষারই ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক। জ্ঞানের স্রোতকে সংযত করা, বাঁধের মধ্যে গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা সহজ। কিন্তু ভক্তির বন্যা যখন নামে, তাহার প্রবল বেগকে ভাষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব—সে বন্যা কেবল ভাষার কেন, সর্ব্ববিধ গণ্ডীরই সীমা ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করে।

২৫। অযথা ভক্তিবাদের ফল।

কর্ম্মের গণ্ডী ও জ্ঞানের গণ্ডী ভেদ করিয়া যে অহেতুকী ভক্তিবাদ প্রচারিত হইল, তাহার ফলে একদিকে জনসমাজ সরস হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু অনেকস্থলে অসংযত সরসতার কারণে বহুবিধ আগাছা প্রভৃতিরও সৃষ্টি হইয়া চলিল। তখন বৌদ্ধদিগের বুদ্ধভক্তির সঙ্গে চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ মিশ্রিত হইয়া যে অসঙ্গত গুরুবাদ প্রভৃতির জন্মদান করিল, আজও তাহার স্রোত নিতান্ত ক্ষীণ হয় নাই। চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদসমূহের অন্যায় বাঁধনসকল কাটিয়া দিতে সক্ষম হইলেও পরিণামে নিজের স্থান সোয়াস্তিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে নানা প্রকারের গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইল। মায়াবাদ প্রকাশ্যে গৃহীত না হইলেও, এমন কি পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও তাহার মূলভাব বৈষ্ণবদিগের অযথা গুরুবাদ নরপূজা প্রভৃতি মতসমূহের প্রতিষ্ঠাপ্রদানে, স্থায়িত্বপ্রদানে বড় অল্প সাহায্য করে নাই। মায়াবাদের মূল উৎস জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সহজেই বৈষ্ণবদিগেরও অন্তরে প্রত্যয় জন্মাইতে লাগিল যে, "গুরুই ঈশ্বর, গুরুই ত্রাণকর্ত্তা—ভগবানই গুরুর আকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র।

২৬। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান।

অসঙ্গত ভক্তিবাদের পরিণামে অযথা গুরুবাদ প্রভৃতি আসিবার কারণে ভারতের উপরে পরাধীনতা তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিল। ইতিপূর্ব্বে ভারতবাসীরা যবনদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেটুকু বাকী ছিল, অতিরিক্ত ভক্তিবাদের প্লাবনে তাহাও বিলুপ্ত হইবার পথে বসিল। এই আধ্যাত্মিক পরাধীনতা অল্পে অল্পে জনসাধারণের অন্তরে বিঁধিতে লাগিল—পীড়া দিতে লাগিল। ইহা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা অনেক দিক হইতেই চলিতে লাগিল, কিন্তু নেতার অভাবে সম্ভবপর হইতেছিল না। অবশেষে সেই গুরুবাদ প্রভৃতি মতসকল শতবিধ অসদাচারের ভিতর দিয়া বড় কদর্য্য মূর্ত্তিতে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন ইউরোপীয়দিগের সহিত সংঘর্ষের ফলেই হৌক অথবা যে কোন কারণেই হৌক, স্বাধীনতার আকাংক্ষা ভারতবাসী জনসাধারণের প্রাণে খুবই নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সেই আদিমতম কাল অবধি আজ পর্য্যন্ত যে কোন ভাবধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সকলের কেন্দ্রে ঈশ্বরকে রাখিতে, তাহা প্রকাশ্যভাবেই হউক বা ফল্গুধারার ন্যায় অন্তর্নিগূঢ় ভাবেই হৌক, ভারতবাসী ভুলে নাই। বর্ত্তমান যুগেরও আদিম অংশে ঐ যে স্বাধীনতার আকাংক্ষায় জনসাধারণের চিত্ত আলোড়িত হইয়াছিল, উহারও কেন্দ্রে ঈশ্বরকে রাখিয়া ভারতবাসী স্বাধীনতালাভের পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাই এই আকাংক্ষা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া এবং তাঁহার সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় ইংরাজদিগের সহিত সমরে নামিয়া সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যুক্ত হন নাই, কিন্তু দেশবাসীকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতালাভেরই পথ প্রদর্শন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ গুরুবাদ, ঐ মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া তাহার স্থলে ভগবানের বিশুদ্ধ পূজা প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে আমাদের কোন প্রকার পরাধীনতাই ঘুচিবে না। তাই ব্রহ্মোপাসনা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপনেই প্রাণপাত করিলেন।

২৭। ব্রাহ্মসমাজের আদিমভাব উপাসকমণ্ডলী গঠন।

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসকদিগের একটী মণ্ডলী গঠিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্ম বলিয়া বংশগত এক নবতর জাতি সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি কখনও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নানা উপায়ে ঐ মণ্ডলীই সংগঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পর ঐ বিষয়েই যত্নবান ছিলেন। ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মোপাসনার মূলমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—পরব্রহ্মে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন।

২৮। ব্রাহ্মসমাজের সমন্বয়সাধন।

কালমাহাত্ম্যে এবং ঘটনাচক্রে রাজা রামমোহন অবধি অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যসকল ও উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতি কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় অথবা কেবল

মাত্র দেশজ ভাষায় নির্ব্বাহিত না হইয়া সুবিধামত, প্রয়োজন মত সংস্কৃত বা দেশজ ভাষায় সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে; কেবল তাহাই নহে, আবশ্যক হইলে ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষাতেও উহা সম্পন্ন হইবার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ কোনও আপত্তি করেন না বা বাধা প্রদান করেন না। কেবল ভাষায় নহে, কিন্তু ধর্ম্মভাবেও ব্রাহ্মসমাজ সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের উপাসকগণের কোন বিষয়ে কোন প্রকার অযথা বিরোধ আনয়ন করা সঙ্গত নহে। তাই রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধনিবন্ধাদিতে ভক্তিমূলক দ্বৈতবাদ এবং জ্ঞানমূলক অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত জাতীয় ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যদি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের মধ্যযুগে অতিরিক্ত বিদেশীয় ভাবধারা প্রবেশ করাইয়া জাতীয় ভাবের সহিত একটা বড় রকমের বিচ্ছেদ আনয়ন না করিতেন, তবে ভারতের মুখশ্রী অন্যতর দেখিতাম নিঃসন্দেহ; তবে ব্রাহ্মসমাজের বিজয় বৈজয়ন্তী ভারতের গৃহে গৃহে প্রকাশ্যে মুক্তগগনে উড্ডীন হইতে দেখিতাম, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। তবে প্রত্যেক পল্লী হইতে ব্রহ্মনামের জয়গান বাহির হইয়া আকাশের পরতে পরতে ধ্বনিত হইত। ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়া লইলে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই আমাদের হস্তগত হইত।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

পূর্ণ ষড়জ—একতালা।

একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে
আনন্দবসন্ত সমাগমে
বিকশিত প্রীতিকুসুম হে
আনন্দ বসন্তসমাগমে পুলকিত চিত্ত-কাননে।
জীবন লতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে
আনন্দ বসন্ত সমাগমে কিরণ মগন গগনে।

স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণীদেবী। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{ননা II না র্সা না। পা -া পা। মা পা মা। জ্ঞা রা সন্‌া I সরা গা -া। মা -া গা।
একি লা ০ ০ ব ০ ণ্যে পূ ০ র্ণ প্রা ০ ণ০ প্রা ০ ০ ণে ০ শ

০ ১ ॥ ২´ ৩ ০ ১
। মা -া -া। -া -া -া I মা -া -া। মা জ্ঞা রা। জ্ঞা -া -া। জ্ঞা রা সা I
হে ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ন ০ ন্দ ব ০ ০ স ০ ন্ত

২´ ৩ ০ ১ [-া]
I রা -া -া। রা সা ন্‌া। সা -া -া। -া -া ননা} I
স ০ ০ মা ০ গ মে ০ ০ ০ ০ একি

২´ ৩ ০ ১ ২´
{I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা। র্মর্জ্ঞা -া -া। র্রা -া র্রা। র্সা র্সা না I র্সা -া -া।
বি ক শি ত ০ ০ প্রী ০ তি কু সু ম হে ০ ০

৩ ০ ১
[না -া -া পা -া -া মা -া জ্ঞা] ২´ ৩ ০
। -া -া -া । -া -া -া । নর্সা র্রজ্ঞা র্মা (I র্মা -া -া । র্মা জ্ঞা র্রা । জ্ঞা -া -া ।
• • • • • • •• •• • আ • • ন • ন্দ ব • •

১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা র্রা র্সা I র্রা -া -া । র্রা র্সা না । র্সা -া -া । -া নর্সা র্রজ্ঞা I)}
স • ন্ত স • • মা • গ মে • • • •• ••

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা মা । মা পা পা । না না না । -া -া ননা II
পু ল কি ত চি ত কা ন নে • • "একি"

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{I মা -া পা । মা জ্ঞা রা । দজ্ঞা -া -া । রা সা রা I সা ন্‌া সা । সা জ্ঞা রা ।
জী • • ব ন ল তা • • অ ব ন তা • • ত ব চ

০ ১
। জ্ঞা রা জ্ঞা । মা -া -া I}
র • • ণে • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা র্রা । জ্ঞা -া জ্ঞা । র্রা -া র্রা । র্সা -া না I র্সা -া -া । -া -া -া ।
হ র ষ গী • ত উ • চ্ছ্ব সি • ত হে • • • • •

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। নর্সা র্রজ্ঞা র্মা । -া -া -া I র্মা -া -া । র্মা জ্ঞা র্রা । জ্ঞা -া -া । জ্ঞা র্রা র্সা I
•• •• • • • • আ • • ন • ন্দ ব • • স • ন্ত

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্রা -া -া । র্রা র্সা না । র্সা -া -া । -া নর্সা র্রজ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা র্রা । জ্ঞা -া জ্ঞা ।
স • • মা • গ মে • • • •• •• হ র ষ গী • ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্রা -া র্রা । র্সা -া না I র্সা -া -া । না -া -া । পা -া -া । মা -া জ্ঞা I
উ • চ্ছ্ব সি • ত হে • • • • • • • • • • •

২´ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । মা পা পা । না না না । -া -া ননা II II
কি র ণ ম গ ন গ গ নে • • "একি"

ভৈরবী—একতালা।*

সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২´ ৩ ০ ১
দ্‌া ণ্‌া II সা সা সা। সা সঋা ণ্‌া। সজ্ঞা রা রজ্ঞা। মজ্ঞজ্ঞা -া দ্‌া I
স ং সা র, য বে, ম ০ ন কে ০ ড়ে ল ০ ০ ০ ০ ০ য়

২ ৩ ০ ১ ২´
I দ্‌া ণ্‌া সা। জ্ঞা ঋা ঋা। সা -া -া। -া -া -া I ণ্‌া সা দা। দা পা -জ্ঞা।
জা গে না য খ ন প্রা ০ ০ ০ ০ ণ্‌ ত খ নো হে না থ্‌

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা মপদণা দা। পা মা -া I মা ঋা ঋা। মা জ্ঞা রা। রজ্ঞা -মজ্ঞজ্ঞা -া। -া দ্‌া ণ্‌া II
প্র ণ০ ০ ০ মি তো মা য়্‌ গা হি, ব সে, ত ব গা ০ ০ ০ ০ ০ ন্‌ "স ং"

২´ ৩ ০ ১ ২´
II{মা -দা দা। দা দা দণা। ণা র্সা র্সা। র্সা র্সা দা I দা -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা।
অ ন্‌ ত র, যা মী০ ক্ষ ম সে আ মা র্‌ শূ ০ ন্য০

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। র্ঋর্সা র্সা র্সা। ণা র্সা র্ঋর্সা। র্সণা ণা -দা} I দা -া দা। দা দা দা। দা পদণা দা।
ম০ নে র বৃ থা, উ০ প০ হা র্‌ পু ০ ষ্প বি হী ন পূ জা০ ০ আ

১´ ২´ ৩ ০ ১
। দা পা মা I মা -ঋা ঋা। মা জ্ঞা রা। রজ্ঞা -মজ্ঞজ্ঞা -া। -া দ্‌া ণ্‌া II
য়ো জ ন ভ ০ ক্তি বি হী ন তা০ ০ ০ ০ ০ ন্‌ "স ং"

২´ ৩ ০ ১ ২´
II দ্‌া ণ্‌া সা। সা সা দ্‌া। দ্‌া -জ্ঞা জ্ঞঋা। ঋা -া সা I সা দা পা।
ডা কি, ত ব, না ম্‌ শু০ ষ্ক০ ক ণ্‌ ঠে আ শা, ক

* ভৈরবীতে কোমল ঋ-ই লাগে; কিন্তু কোন কোন গায়ক মাধুর্য্যের জন্য কোন কোন স্থলে শুদ্ধ রি-ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

```
৩                    ০                 ১                  ২´                 ৩
| পা পমা পা |     দা -া -া^প |     মা -া -া I       পা ণা ণা |        দা পা মা |
  রি, প্রা০ ণ       প ০ ০            শে ০ ০           নি বি ড়           প্রে মে র

০                    ১                                   ২´                  ৩
| জ্ঞরা জ্ঞরা জ্ঞরা |   জ্ঞরা জ্ঞরা মজ্ঞা I    দ্দা ণ্দা সা |        জ্ঞা ঋা ঋা |
  স০ র০ স০             ব০ র০ ষা              ষ দি, নে            মে, আ সে

০                    ১                 ২´                 ৩                   ১
| ঋা সা -া |        -া -া -া I     {ঋা দা দা |         দা দা দণা |        ণা র্সা র্সা |
  ম নে ০             ০ ০ ০            স হ সা              এ ক দা০             আ প না

১                    ২´                ৩                  ০                   ১
| র্সা র্সা র্সা I     ণা র্সা র্ঋা |     র্ঋা র্ঋা র্সা |     ণা র্সর্ঋা র্সণা |     ণদা দপা পা} I
  হ ই তে              ভ রি, দি          বে, তু মি           তো মা০ র০            অ০ মৃ০ তে

২´                   ৩                 ০                  ১                   ২´
I সা দা দা |        দা দা -া |      দা পদণা দা |         দা পা মা I          মা -জ্ঞা জ্ঞা |
  এ ই, ভ              র সা য়্            ক রি০ ০ প           দ ত লে              শূ ০ ন্য

৩                    ০                 ১
| মা জ্ঞা রা |      রজ্ঞা -মজ্ঞজ্ঞা -া |  -া দা -ণ্ II II
  হ দ য়              দা০ ০০০ ০            ন্ "স ং"
```

ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব।

(২)

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বিদ্যার্ণব এম-এ)

ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার-নারদসংবাদ—যাহা ভূমাতত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ, আর একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। আখ্যানটী এই—

নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ভগবন্ আমাকে শিক্ষা দিন্। সনৎকুমার বলিলেন, তুমি কি জান তাহা আমাকে বল, তাহার পর যদি অতিরিক্ত থাকে বলিব।

নারদ বলিলেন,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ব-বেদ, ইতিহাস-পুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, বেদের বেদ (ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব-উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র (কালতত্ত্ব), তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (গন্ধর্ব্ববিদ্যা)—আমি এই সমুদয় অবগত আছি, কিন্তু এই প্রকার বিদ্বান হইয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিৎ—আত্মবিৎ নহি। ভগবৎসদৃশ লোকের নিকট শুনিয়াছি, আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকময়, ভগবান্ আমাকে শোকের পরপার লইয়া যাউন।

সনৎকুমার বলিলেন,—তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ, তাহা নাম (অর্থাৎ বাক্য) মাত্র। নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে নামের যতদুর গতি, ততদুর পর্য্যন্তই লাভ হয়। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, নাম অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?

সনৎকুমার বলিলেন, হাঁ,—তাহা বাক্। কারণ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে—ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য-

অসত্য, সাধু অসাধু, প্রীতিকর বিষয় অপ্রীতিকর বিষয়, এ সমুদয়কে বাক্ বিজ্ঞাপিত করে।

কিন্তু বাকেরও উপর আছে, তাহা মন। যেহেতু, হস্তের মুষ্টি যেমন দুইটী আমলক ফলকে ধারণ করে, মন তেমনি বাক্ ও নামকে ধারণ করিয়া থাকে। আগে মন স্থির করে, তাহার পর বাক্যের কার্য্য আরম্ভ হয়; সুতরাং মন বাক্যের ধারক, বাক্যকে আশ্রয় করিয়া নাম।

কিন্তু মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে, তাহা সঙ্কল্প। প্রথমে মন সঙ্কল্প করে, পরে চিন্তা করে, তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে, তাহার পর ইহাকে নাম-উচ্চারণে প্রেরণ করে। সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষ প্রথমে অনুভব করে, তাহার পর সঙ্কল্প করে, তাহার পর মনন করে, মনন বাগিন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করে, তৎপর তাহাকে নাম উচ্চারণ করিতে প্রেরণ করে। চিত্তেই সঙ্কল্পাদি সকলের গতি, সুতরাং চিত্তই ইহাদের আত্মা ও প্রতিষ্ঠা।

চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। নিরন্তর সঙ্কল্পের অভ্যুদয় হেতু চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল। চঞ্চলতা বশতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে চিত্তে মহত্ত্বের সঞ্চার হইতে পারে না, সেইজন্য এই চঞ্চলতার নির্ব্বাসন প্রয়োজন, ইহা ধ্যান-সাপেক্ষ। ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান বলিতে শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে জ্ঞান বুঝায়—কোন একটা কিছুকে অবলম্বন না করিয়া ধ্যান হইতে পারে না। বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ঋষি বলিতেছেন, ঋগ্বেদাদি বেদসকল ও অন্যান্য যত কিছু বিদ্যা এবং যাহা কিছু ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, শুভ অশুভ, অন্ন রস, ইহলোক পরলোক ইত্যাদি এই সমুদয়ই বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়।

বিজ্ঞান অপেক্ষাও বল শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান্ ব্যক্তি শত বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও কম্পিত করিতে পারে। বলবান্ ব্যক্তি উদ্যমশীল হইতে পারে। উদ্যমশীল হইয়া গুরুর পরিচর্য্যা করিতে পারে ও তাঁহার সমীপে উপবেশন করিয়া দর্শন, শ্রবণ, মনন করিতে পারে, বুঝিতে পারে, কর্ম্ম করিতে পারে। এমন কি, বল-বশতঃ ঐ পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। বিজ্ঞান অপেক্ষা বলকে শ্রেষ্ঠ বলায়, বস্তুত মানসিক বল ভিন্ন বিজ্ঞান-বান্ ব্যক্তিরও কার্য্যসফলতার সম্ভাবনা বিরল।

অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেইজন্য কেহ যদি দশ-রাত্রি (অর্থাৎ দশ দিন ও দশ রাত্রি) সমানে অন্নগ্রহণ না করে, সে যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলেও সে দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, মনন করিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, কর্ম্ম করিতে পারে না, কিন্তু অন্নগ্রহণ করিলে সবই পারে।

জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যখন সুবৃষ্টি না হয়, তখন অন্ন অল্প উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণসকলের কষ্ট উপস্থিত হয়। আর যখন সুবৃষ্টি হয়, অন্ন প্রচুর হইবে ভাবিয়া প্রাণসকল আনন্দিত হয়। যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান এ সকলই জলের মূর্ত্তি। জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য এই তেজ বায়ুর গতি অবরুদ্ধ করিয়া যে সময়ে আকাশকে উত্তপ্ত করে (এতদ্বায়ুমুপগৃহ্যাকাশ-মভিতপতি), তখন লোকে বলে বায়ু স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে গাত্রদাহ উপস্থিত, বৃষ্টি হইবে। (পাঠান্তরে "উপগৃহ্য"স্থানে "আগৃহ্য" আছে এই পাঠে অর্থ তেজ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশকে উত্তপ্ত করে; কিন্তু বৃষ্টিবর্ষণের পূর্ব্বে বায়ু স্তম্ভিত হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত করে, ইহাই সচরাচর দৃষ্ট হয়)।

তেজ প্রথমে এই অবস্থা দেখাইয়া পরে বারিবর্ষণ করে। আর এই তেজই উর্দ্ধগামী ও বক্রগামী বিদ্যুৎ দ্বারা ঘোর শব্দ করিতে থাকে,—লোকে বলে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে, গর্জ্জন হইতেছে, বর্ষণ হইবে। তেজই সেই পূর্ব্ব লক্ষণ দেখাইয়া পরে জল উৎপন্ন করে। তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য আকাশেই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র বিদ্যুৎ অগ্নি স্থিতি করে। আহ্বান শ্রবণ ইত্যাদি আকাশযোগেই সম্পন্ন হয়, আকাশেই স্থিতি, আকাশেই আমোদ, আকাশেই বিষাদ, আকাশেই জন্ম।

আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যদি বহু-জনও থাকে, (আকাশকে আশ্রয় করিয়াই স্মৃতি) যদি তাহাদের স্মরণ না থাকে, তাহাদের কেহ কাহাকেও চিনে না, কেহ কাহাকেও জানে না, কেহ কাহাকেও শুনে না। নামরূপ যাহা কিছু নিয়ত আকাশে প্রকাশ পাইতেছে। একমাত্র স্মরণের সাহায্যেই তাহাদিগকে জানিতে পারা যায়। স্মরণ না থাকিলে ইহারা থাকিয়াও নহে—সুতরাং আকাশ অপেক্ষা স্মরণ শ্রেষ্ঠ।

স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ। আশাই সমুদয় উদ্দী-পনার মূল। আশা দ্বারা প্রণোদিত স্মৃতি মন্ত্রাধ্যয়ন করে, (পুরুষ মন্ত্রসকল স্মরণ রাখে) কার্য্য করে, পশু-পুত্র ইচ্ছা করে, ইহলোক পরলোক ইচ্ছা করে।

আশার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকিলে বিষয়সকল অচিরেই স্মরণ পথের বাহির হইয়া যায়—আশার উপর নির্ভর করিয়া যেন স্মরণ জাগ্রত থাকে। আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। আশা উদ্যম প্রভৃতি সকলই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। রথচক্রের অরসমূহ যেমন রথের নাভিতে নিহিত থাকে, তেমন সমুদয়ই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত

আছে। সুতরাং যিনি প্রাণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলেন, তিনি সত্যাবলম্বনে সেই কথা বলিতেছেন। যখন মানুষ বিশেষরূপে জানে, তখনই সত্য বলে। সুতরাং সত্য বিজ্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু মনন ব্যতীত কোন কিছুই বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে না, এবং শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে, তাহার মননও চলে না—শ্রদ্ধা আবার নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে।

শ্রুতি বলিতেছেন—

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্ধধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।

মানুষ যখন গুরুতে নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে, নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে না। এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।

নিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, যাহাতে ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ; সুখলাভেচ্ছাই মানুষকে কর্ম্মে প্রয়োচিত করে, কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সুখ। সুতরাং সুখই সকল উদ্যমের মূল উৎস, সুখের স্বরূপ হইল ভূমা।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহা অল্প। ভূমা যাহা তাহাই অমৃত, অল্প যাহা তাহাই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল। ভূমা সর্ব্বময়, আপনার মহিমাতে আপনি অবস্থিত। ভূমা-তত্ত্ববিৎ সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন।

পূর্ব্বে যে আনন্দের কথা বলা হইয়াছে, সেই আনন্দ ও এই সুখ একই বস্তু।

যে পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। মনন ব্যতীত কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না; আবার যাহাকে মননের বিষয় করিতে হইবে, তাহার উপর যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তদুপরি মনোনিবেশ হইতে পারে না। শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা ভিন্ন শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। নিষ্ঠা উৎপন্ন করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন এবং তাহা কর্ম্মসাপেক্ষ। কর্ম্মের মূল উৎস সুখান্বেষণ। ভূমাই সুখস্বরূপ।

পরিমিত বিষয়ে সুখ পরিমিত, সুতরাং তাহা ক্ষয়িষ্ণু; তাই বলিয়াছেন "নাল্পে সুখমস্তি"।

ওঙ্কার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা তত্ত্বের দিক হইতে। শ্রুতি ইহার আর একটি পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সাধনার দিক।

কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ
ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

বেদ যে স্বরূপের কীর্ত্তন করে, সমুদয় তপস্যায় যাঁহার মনন হয়, এবং যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সংযমিগণ ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিয়া থাকেন, ওঁ এই মন্ত্রটী সেই স্বরূপ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।

এই যে অক্ষরটী ইহা সর্ব্বগত ব্রহ্ম, ইহাই সর্ব্বাতীত ব্রহ্মও বটে। ইহাকে জানিয়া যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়।

তাহার পরই বলা হইয়াছে—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।

(ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য) এই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এই অবলম্বন উচ্চতম, (সাধক) এই অবলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয়েন। এখানে ওঁ এই মন্ত্রটীকে ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক বলা হইয়াছে।

তাহার পর শ্রুতি যমের মুখ দিয়া নচিকেতাকে বলিতেছেন,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ওঁ এই অক্ষরটী সর্ব্বগত ব্রহ্ম, সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম, ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক, এবং ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ আলম্বনও বটে—কিন্তু তাহার উপলব্ধি সাধনসাপেক্ষ। এই সাধনের বিশেষ সঙ্কেত রহিয়াছে। সেই সঙ্কেত অবগত হইতে হইতে হইলে আচার্য্যের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন; তাই যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,

সেই পরমতত্ত্ব উপদেশচ্ছলে যতদূর বলা সম্ভব তোমাকে বলা হইল। এইক্ষণ তুমি ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট গিয়া সেই সাধনতত্ত্ব অবগত হও।

কঠোপনিষদ্-শ্রুতিতে ওঁ এই পদটীকে একদিকে বেদ যে স্বরূপের কীর্ত্তন করেন সেই স্বরূপ বলা হইয়াছে, অপর দিকে ইহাঁকে ব্রহ্মলাভের উপায়ও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, শ্রুতি ওঁ-শব্দকে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের ভাষামাত্র মনে করেন না।

ওঁ একটী প্রসিদ্ধ মন্ত্র। শাস্ত্র মন্ত্রের এই লক্ষণ বলেন,

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণামস্মাৎ মন্ত্র উচ্যতে॥

যাঁহার মনন হইতে বিশ্ববিজ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হয়, সেই অর্থে প্রথম ভাগ "মন্" এবং সংসারবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি হয় এই অর্থে শেষ ভাগ "ত্র" এবং এতদুভয়ের সমষ্টিতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের আমন্ত্রণ যাহা হইতে হয়, তাহার নাম মন্ত্র।

এখানে বিশ্ববিজ্ঞানের অর্থ বিশ্বসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ডসত্তা যে পৃথক্ নহে, সেই জ্ঞান বুঝায়।

পাতঞ্জল-দর্শনে সূত্রকার যোগীদিগের সমাধিলাভ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে ঈশ্বরের নাম করিয়াছেন এবং প্রণব বা ওঙ্কারকে তাহার বাচক বলিয়াছেন। আলোচনার বিষয় ছিল, কি প্রকার যোগীদিগের সমাধি ও সমাধিফল (কৈবল্যলাভ) আসন্নতম হয়। তিনি শ্রদ্ধা বীর্য্যাদি সহকারে সাধনশীল যোগীদিগকে মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র-ভেদে নয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, অধিমাত্র তীব্র সংবেগশালীর সমাধি আসন্নতম হয়।

সংবেগ অর্থে সাধনকার্য্যে বৈরাগ্যমূলক কুশলতা বুঝায়; কতকটা, দূরত্ব হিসাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কার্য্যকারিতার ন্যায়। শূন্য হইতে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট কোন পদার্থের গতি এই শক্তির প্রভাবে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়া যতই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তাহার বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; সেইরূপ তীব্র-সংবেগী যোগী বৈরাগ্যাদি সংস্কারযুক্ত হইয়া সাধনকার্য্যে ক্রমশঃ অধিকতর দ্রুতগতিতে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তীব্র-সংবেগী যোগীরা আবার মাত্রার তারতম্যানুসারে মৃদুতীব্র-সংবেগী, মধ্যতীব্র-সংবেগী ও অতিমাত্রতীব্র-সংবেগী নামে অভিহিত এবং যথাক্রমে তাঁহাদের সমাধি ও সমাধিফল, আসন্ন, আসন্নতর ও আসন্নতম হইয়া থাকে।

ইহা যে অত্যন্ত আয়াস ও যত্নসাপেক্ষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, আসন্নতম সমাধিলাভের অন্য উপায় আছে কিনা—(কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি, অথাস্য লাভো ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বেতি)

ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিলেন,

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।

ঈশ্বর-শব্দের দর্শনশাস্ত্রে এই প্রথম প্রয়োগ। ঈশ্বরপ্রণিধান বলিতে ঈশ্বরে পরা ভক্তি বুঝায়। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করতঃ তাঁহাতে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকা এই ভক্তির স্বরূপ। এই অবস্থাই বলা যাইতে পারে।

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। "কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥"

এই ঈশ্বর ব্রহ্ম নহেন। তিনি পুরুষবিশেষ। কৈবল্য-লাভ হইয়াছে, তেমন পুরুষ অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলকেই ত্রিবিধ বন্ধন ছেদন করিয়া ঐ অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে। ঈশ্বরে কোনরূপ বন্ধন ভূতকালে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না,—তাই তিনি পুরুষবিশেষ। তাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্য ও অতিশয়শূন্য অর্থাৎ যে পুরুষে ঐশ্বর্য্যের কাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়াছে, যাহার অপেক্ষা মহৎ ঐশ্বর্য্য আর নাই, তিনিই ঈশ্বর। তিনি প্রধানতত্ত্বও নহেন, পুরুষতত্ত্বও নহেন, পরন্তু প্রধান-পুরুষনির্ম্মিত; এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ তাঁহাতে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাঁহার বাচক প্রণব বা ওঁ শব্দ। এখানে বাচ্য ও বাচক সম্বন্ধ উক্ত হইল। ঈশ্বর বাচ্য, প্রণব বা ওঁ বাচক। বাচ্য-শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বর যে জ্ঞেয় তাহা বুঝাইতেছে। এই জ্ঞেয়ে উপনীত হইবার (ইঁহাকে জানিবার) আলম্বন (সেতু, ভেলা) হইল প্রণব।

তিনি পুরুষবিশেষ। অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশলাকুশল (পাপপুণ্য) কর্ম্ম, কর্ম্মের ফলরূপ বিপাক এবং বিপাকের অনুরূপ আশয় (বাসনা)—এই সকল দ্বারা সম্পূর্ণরূপ অস্পৃষ্ট, সুতরাং তিনি সাধারণ পুরুষ (জীব) হইতে স্বতন্ত্র। কর্ম্ম হইতে যখন বিপাক উপজাত হয়, সেই বিপাকের অনুরূপ বাসনাসকল মনে বর্ত্তমান থাকিয়া সাধারণ পুরুষ বা জীবে ব্যপদিষ্ট হয়, তাহাতে পুরুষ সেই ফলের ভোক্তাস্বরূপ হন। যথা জয় বা পরাজয় যোদ্ধৃ সৈনিকসকলে বর্ত্তমান থাকিয়া সৈন্যস্বামী বা সেনানায়কে তাহা যেরূপ ব্যপদিষ্ট হয়। ঈশ্বর এই সকল ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মবিপাক ও আশয় হইতে সদামুক্ত; কিন্তু তিনিও প্রধান-পুরুষনির্ম্মিত এবং এই জগতের (phenomenal world) স্রষ্টা ও প্রকাশক।

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের পরিণামবাদ (Evolution); ইহাদিগের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তায় অবস্থিত। প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বমূলক, পুরুষ সংখ্যায় অনন্ত। বেদান্ত-দর্শন বিবর্ত্তবাদমূলক (Illusion)। ইহার মতে এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, একমাত্র অবিদ্যাই ইহার কারণ, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই একাংশ। ব্রহ্ম বিশ্ব

হইতে অতীতরূপেও আছেন; তখন তিনি অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় এবং ইহাই তাঁহার স্বরূপ।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" এই সকল বাক্যে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে চেতন ও অচেতনকেও বিশ্বের অন্তরাত্মারূপে এবং সর্ব্বাত্মকরূপে ব্রহ্মের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে।

কলিকাতার প্রাচীন কাহিনী।

(শ্রীহরিহর শেঠ)

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ইনি একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। ইনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শুঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র, প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র মোগল বাদসাহের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বংশানুক্রমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী করিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার পিতা সম্মত হইলেন না এবং মেডিক্যাল কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। তৎপরে তিনি আইন শিক্ষা করেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং তৎপরে "রহস্য সন্দর্ভ" নামক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে তিনি ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের পরিচালক নিযুক্ত হন। কলিকাতা করপোরেশন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সরকার কর্তৃক একজন কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ১৮০১ * খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সভাপতি হইয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ফার্শি, হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া ভিন্ন গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষাও জানিতেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার মত পণ্ডিত এবং বহুভাষাবিৎ বাঙ্গালী আর কেহ ছিলেন না। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্ ল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রায়বাহাদুর, পরবৎসর সি-আই-ই এবং পরে রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি মাসিক ৫০০ টাকা বিশেষ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ৬নং মাণিকতলা রোডে তাঁহার বাসভবন ছিল।

* ১৮৪৩ (?) তং সং।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে মাতামহাশ্রমে ইঁহার জন্ম হয়। দরিদ্রতা নিবন্ধন ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। প্রথম টালক্ কোম্পানীর নীলামঘরে দশ টাকা বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে পঁচিশ টাকা বেতনে মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসে প্রবেশ করিয়া শেষে চারিশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। হরিশ্চন্দ্রের ইংরাজি ভাষার উপর দখল যথেষ্ট ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দুপেট্রিয়ট নামক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে কখন উহার ১৫০ জনের অধিক গ্রাহক হইত না। কিন্তু এই পত্রিকার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তিনি দরিদ্রদের জন্য সর্ব্বদা লেখনী পরিচালন করিতেন। ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণের চাঁদায় ১০৫০০ টাকায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ ভবনে তাঁহার নামে একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ্যের উজ্জ্বল আদর্শ স্যার গুরুদাস ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। হিন্দু আইনের অভিজ্ঞতা জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এল উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং এই বৎসরই "নাইট্" উপাধি ভূষিত হন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সলার হন এবং

১৮৯২তে গবর্ণমেন্ট স্থাপিত ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটি কমিশনের কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও তিনি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অন্তরে বাহিরে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সরলচিত্ত, বিনয়ী, পণ্ডিত, সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ বাঙ্গালী অধুনা দুর্লভ।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর।

ইনি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৃদ্ধ পিতামহ ছিলেন। এই বংশের পঞ্চানন ঠাকুর সপ্তদশ শতাব্দীতে কলিকাতার জঙ্গল কাটাইয়া বাস স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র জয়রাম প্রথম পাথুরিয়াঘাটার আইসেন। দর্পনারায়ণ চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেন্টের অধীনে দেওয়ানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

হরচন্দ্র ঘোষ।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বেহালার ঘোষ বংশে ইঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের পর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে গভর্ণর জেনারেলের দেওয়ানের পদ দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তৎপরে তিনি নূতন সৃষ্ট মুনসেফের পদে একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এক বৎসরের মধ্যে বাঁকুড়ার সদর আমিনের পদে উন্নীত হন এবং ছয় বৎসর তথায় থাকিয়া হুগলিতে বদলি হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দুই বৎসর পরে ছোট আদালতের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজ। তিনি একজন উচ্চ নীতির আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া ও বেহালায় দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বেথুন স্কুল কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি টাউনহলে একটি শোকসভা হয়। ছোট আদালতের সম্মুখের বারাণ্ডায় তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্যারীচরণ সরকার।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথমে হেয়ার স্কুল পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া তিনি শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও বারাসাত স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ইনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরিশেষে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনিই এ কলেজের ইংরাজী ভাষার প্রথম অধ্যাপক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় সুরাপাননিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইংরাজিতে Well-wisher এবং বাঙ্গালায় "হিতসাধক" বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তিনি তাঁহার সময়ের প্রায় সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি অন্নসত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করেন। তাঁহার লিখিত ইংরাজি শিক্ষা বিষয়ক বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি আজিও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

১৮২৯ সালের ২৭শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কাশীনাথ ঘোষ মহাশয় একজন দাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। গিরীশচন্দ্র প্রথম ১৫৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মিলিটারি অডিটার জেনারেল অফিসে বদলি হন এবং বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৫০৲ টাকা হয়। এই স্থানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন এবং ইহা ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। গিরীশচন্দ্র তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য শেষে ৩৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন। তখন তিনি রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ ইহা নহে। সংবাদপত্রসেবক ও বক্তারূপেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম তিনি কৈলাসচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত Literary Chronicleএ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ চন্দ্রের সহিত একত্র The Bengal Recorder নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। ইহা মাত্র দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে The Hindoo Patriot প্রকাশ করিয়া ১৮৫৫ পর্য্যন্ত—হরিশ্চন্দ্র উহার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা সম্পাদন করেন। পুনরায় তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধুর মাতা ও পত্নীর জন্য কিছুদিন পেট্রীয়টের

ভার লইয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ১৮৬৯এ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি দক্ষতা ও স্বাধীনতার সহিত উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ড্রালঃউসি ইনষ্টিটিউট, বেথুন সোসাইটী, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রভৃতি যে সকল সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন, তথায় অনেক ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হলে রামদুলাল দে সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই পরে বর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া রামদুলাল দের জীবনীরূপে প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি বেলুড়ে বাস করিয়াছিলেন। তথায় একটী সামান্য বাঙ্গলা পাঠশালাকে তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনররূপেও যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী।

সমাজ সংস্কারকরূপে যে সকল মহাত্মা এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেব প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির স্কুল, যাহা পরে হেয়ার স্কুল নামে অভিহিত হয় তথায় অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব ইঁহার চরিত্রে যথেষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এবং তাহারই ফলে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসিক কৃষ্ণমল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন এবং বর্দ্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া, বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে কতিপয় বৎসর কৃষ্ণনগরে বাস করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। এই স্থানে বাস কালীন বহু জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ মিত্র।

হুগলী জেলার একটী সামান্য পল্লীতে এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে তাঁহার প্রথম শিক্ষা লাভ হয় এবং তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে প্রবেশ করেন। তিনি শীঘ্রই তদানীন্তন আদালতের দুইজন নেতৃস্থানীয় উকিল রমাপ্রসাদ রায় এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রথমোক্ত ব্যক্তিই প্রথম বাঙ্গালী হাইকোর্টের বিচারপতি মনোনীত হন। দ্বারকানাথ প্রথমে ইঁহার জুনিয়ররূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস্ পিকক্ (Sir Barnes Peacock) তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর।

শেরবোর্ণ স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া তিনি বাটীতে সংস্কৃত ফার্সি ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রথম তিনি এলেকজাণ্ডার কোম্পানীর আফিসে কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় তথায় কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। পরে এই ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইলে তিনি একজন লিকুইডেটারের কার্য্য করেন।

তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া The Reformer নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি জমিদার সভার সভ্যরূপে অনেক কাজ করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম তাহার সহকারী সভাপতি এবং পরে প্রায় দশ বৎসর সভাপতির কার্য্য করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সংশ্রবে কার্য্য করায় C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন। বেলগেছিয়ায় দেশীয় সম্প্রদায় রাজপুত্রকে যে অভ্যর্থনা করেন সেই অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে যুবরাজ তাঁহাকে একটী সুন্দর অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, হিন্দু কলেজের একজন গবর্ণর, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনর ও দেশীয় হাঁসপাতালের একজন গবর্ণর ছিলেন। দেশের সকল সৎকার্য্যে তাঁহার সাধ্যমত দান ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

হিন্দুসমাজ-সংস্কার।

(ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ,
পি. এইচ. ডি. বার-এট-ল)

হিন্দুসমাজসম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনটী এইবার চব্বিশ পরগণাস্থিত ক্যানিং টাউনে হয়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে হিন্দুসমাজের সংস্কার-সাধন—জাতিভেদ প্রভৃতি যে সকল কুপ্রথা হিন্দু-জাতিকে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া অন্তঃসারশূন্য ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা দূর করিয়া ইহাতে নব প্রাণ সঞ্চার করা। এক কথায়, সমগ্র হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন ও মিলনপ্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমানে মিলনের যুগ। জগতের সর্ব্বত্রই মিলনের এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্রই মিলনবাণী ঘোষিত হইতেছে। এই সময় কি আমাদের পিছাইয়া থাকা উচিত? মিলনই যে সকল শক্তির মূল এবং মিলনেই যে মুক্তি, একথা আজ জগৎ উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। তাই ত জগতের জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, মিলনের এক মহা উদ্যম সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু এই মিলনবাণী ভারতের পক্ষে কিছু নূতন নহে। এক্ষণে ভারতের এই পবিত্র ভূমিতে ভেদ-মন্ত্রের ফলে যে অনাচার দৃষ্ট হইতেছে, হিন্দুর শাস্ত্র প্রভৃতি আলোচনা করিলে তাহার সারবত্তা কোথাও দৃষ্ট হয় না। বহুযুগ যাবৎ পরাধীন থাকায় হিন্দুজাতির উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র আবর্ত্তে সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং নানারূপ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়া শতবিধ ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুজাতির সকল প্রতিষ্ঠানই এক সনাতন ধর্ম্মভিত্তিরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অজ্ঞানোত্থিত কুসংস্কার যেদিন তাহা বিচলিত করিয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দুজাতি ও সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে এক সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োগেই হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, কিন্তু পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া আজ তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! মানবের কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসংস্কার এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, স্বাস্থ্য হারাইয়া হিন্দুসমাজ এক্ষণে ঘোর ব্যাধিতে জর্জ্জরিত।

এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিতে ভগবানের বিধানে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হয়। আজ এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুর এই সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধারকল্পে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের পক্ষে এক নবযুগের সৃষ্টিসাধন করিয়াছে। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সমাজসংস্কারের সূক্ষটী তিনিই এই যুগে প্রথম পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাহার প্রধান ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজের সকল জাতির মধ্যে মিলনপ্রচেষ্টা। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজকে নানাভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইলেও তাহার ফল শুভই হইয়াছে—যাঁহারা নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া ব্রাহ্ম হইতে বিভিন্ন মনে করিতেন আজ তাঁহারাই যে এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রচেষ্টার সাফল্যের প্রধান পরিচায়ক।

হিন্দুসমাজের এই প্রকার সংস্কার বিষয়ে বাংলাদেশে এক্ষণে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মিশন অন্যতম। যে ভাবে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও ইহাতে পরোক্ষভাবে বা অপরোক্ষভাবে যোগদান করিতেছেন বা সহানুভূতি দেখাইতেছেন, তাহা পরম আনন্দের বিষয় এবং ভারতের পক্ষেও কল্যাণকর। হিন্দু মিশনের উদ্যোগে প্রতি বৎসর অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বর্জ্জন ক'রবার জন্য হিন্দু-সমাজের নানা জাতির সম্মেলনটী এক নবযুগের সূচনা করিতেছে। যে ভেদপ্রথার জন্য হিন্দুজাতি আজ এত দুর্ব্বল ও লোকচক্ষে হীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই কালিমা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে হইবে এবং শুধু কথায় নহে—প্রধানতঃ কাজেও তাহা করিতে হইবে। যে প্রথা হিন্দুজাতিকে ধ্বংসের দিকে লইয়া গিয়াছে, তাহার উচ্ছেদসাধনই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার জন্য বহু সংস্কার আবশ্যক। এই সকল সংস্কার দ্বারা যদি আমরা আমাদের সমাজকে পুনরায় সবল করিতে ও ইহার সকল কালিমা মোচন করিতে না পারি, তাহা হইলে কি প্রকারে আমরা জগতের জনসমাজে নিজদিগকে উপস্থিত করিতে পারিব? যে সকল বিষয়ে আমরা মনে করিতেছি যে অপরে আমাদের উপর অন্যায় করিতেছে, তাহার প্রতীকার কি প্রকারে দাবী করিতে পারিব? নিজেদের শত গলদ থাকিতে কিরূপে অপরের গলদ দেখাইতে পারিব?

কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশের এক বিশিষ্ট নেতা বিলাতে গিয়া এক সভায় বক্তৃতাসূত্রে ইংরাজরা যে আমাদের উপর নানারূপ অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে বলিতেছিলেন। তখন সভা হইতে একজন ইংরাজ শ্রোতা উঠিয়া গিয়া বক্তা মহাশয়কে বলেন যে, পূর্ব্বে নিজ জাতির উপর ন্যায়বিচার করুন, তার পর আমাদের অন্যায় আচরণের কথা বলিবেন। বক্তা মহাশয় আমাদের বলিয়াছিলেন যে, ঐ কথাগুলি শুনিয়া তিনি প্রায় নির্ব্বাক হইয়া

গিয়াছিলেন। আমি যখন বিলাতে ছিলাম তখনও দেখিয়াছি যে, একবার এক বড় সভা করিয়া আমাদের দেশের কয়েকটী বিশিষ্ট নেতা যখন ঐরূপ ইংরাজরাজের ভারতে নানারূপ অন্যায় আচরণের কথা বলিতেছিলেন, তখন সভা হইতে কেহ কেহ উঠিয়া বক্তা মহাশয়কে আমাদের দেশে যে সব অত্যন্ত ঘৃণিত অনাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঐ সকল বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতে চাহেন; তখন বাস্তবিক আমাদেরও মস্তক যেন লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িতেছিল। আমাদের জাতির এই সকল অনাচারের বিষয় দেখি, অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে এবং সত্যই সেইজন্য আমরা অপরের চক্ষে এত হীন। নিজে দোষশূন্য না হইলে কি করিয়া পরের দোষ দেখান শোভা পায়? দোষ সকলের আছে সত্য, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও যে সকল অনাচার অত্যাচার আমাদের সমাজের বক্ষে এখনও বিদ্যমান, সে কথা ভাবিলে অন্য সভ্য জাতির কথা ত দূরে থাক্‌, আমাদের মধ্যেও যাঁহাদের অন্তরে সামান্যও ধর্ম্মভাব আছে, তাহাদেরও অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া যায় না। হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথাটাই এই সকল অনাচার অত্যাচারের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহা আমাদের সমাজদেহে এক বিষাক্ত ক্ষতের ন্যায়। ইহা যে সকল অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা কাহার না জানা আছে? কিন্তু বহুযুগ-সঞ্চিত ঘন তমসার অন্তরালে এক শুভলক্ষণের উদয় হইয়াছে। হিন্দুরা নিজেদের দোষ যে কেবল বুঝিতে শিখিয়াছে তাহা নহে, তাহা এক্ষণে দূর করিবার জন্যও উদ্যমশীল। ভগবান আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন ও শক্তি দিন যেন আমরা মানুষকে মানুষ বলিয়া সম্মান করিতে শিখি; তাহা হইলে আমরাও অপরের নিকট মানুষ বলিয়া গণ্য হইব।

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(6)

59. Evidences of Keshub-Worsnip.

The first intimation of such a practice being in vogue among certain of the followers of the *Samaj* of India was that given by two missionaries of their own party, by a letter published in the *Indian Daily News.* The publication of this letter was actuated by feelings of disgust at so idolatrous a practice being permitted. Those missionaries had witnessed the prostration to and adoration of Keshub while on his tour to Simla by one of his disciples. This letter, fully attested by the signature of the two missionaries, rapidly gained credence, and the more so when we come to consider that it was put forth by missionaries of the *Samaj* of India. The matter caused a great commotion among the Hindu community, and Keshub's opponents were not slow in attacking him on all points. To add to the ferment raised by this letter it was publicly given out, about the same time, by Jodunath Chakerbutty, one of the missionaries mentioned above that Keshub Chunder's colleague, Protap Chunder Mozoomdar, had preached in the following strain to his congregation: "Brethren, should you wish to be saved, come to his (Keshub's) feet and take shelter under them; there is no other way." In a letter from Protap Chunder Mozoomdar to the address of Keshub Chunder on his way to Simla, the latter was styled the "Saviour of Sinners." This behaviour of Protap Chunder recalls to our minds the insinuation of the disciples of Chaitanya and other reformers about the divine nature of their leaders, though the leaders themselves made no pretensions whatever to divine powers.

Another fact has to be recorded. While on his way to Simla, Keshub received the following prayer from a certain disciple: "Daya Maya Prabhu! (O merciful Lord) leave me not alone; save me before you depart. O Gurudeva (god of a spiritual teacher)! Remember this *adham sishya* (vile disciple), when you are on the hills, and do as you will for his salvation. Pradhan! Lord! I am a great sinner; how shall I approach the throne of holiness? I feel myself incapable to pray to the Most High. Do, I beseech you, pray to your father for me!" In this prayer we find Keshub Chunder was distinctly believed to be a mediator between God and

man, and that divine mercy was expected to come through his mediation alone.*

60. Keshub's attitude towords the worship.

And how did Keshub Chunder receive this prayer? Was he startled at this strange mode of address? Did he reprove his disciple for his error? Did he take immediate steps for the removal from the minds of his converts of the wrong impression raised of his powers by preaching, or any other method? We are constrained to say that we have failed to find any proofs that he did. On the contrary it is widely known that on some of his disciples protesting against his connivance at such practices, he said, "I do not wish to obstruct the stream of *Bhakti*." This is not all. We again find him tamely accepting another prayer, made on behalf of the Brahmas of the *Samaj* of India, wherein he has been raised to the dignity of a deity, and far above that of a mediator, as the following extract will show:—†"If you have once allowed me to fling myself at your feet, you should for ever give me that right. It is the faith of my heart that from the feet of such a one as yourself I shall attain salvation." Again: "The dust of your feet, and of such a one as yourself, is the only hope and consolation of this great sinner. Ever shall I place and worship your feet on my hand, and you shall pray to thy father on my behalf."

These instances will serve to show how hero, or rather Keshub-worship was fast gaining ground among the Brahmas of the *Samaj* of India of those days, and how little was done to put to a stop to it.

61. The origin of Keshub-worship to be found in his lecture on *Great Men.*

Whence this idea of hero-worship first emanated it is difficult to discover, though people are not backward to declare that Keshub's followers took the cue from his own writings. For this statement there appears some grounds, for a reference to Keshub's much applauded lecture of "*Great Men*" will find him speaking in the following strain: "What is there on earth so noble as man? The human body is indeed the living tabernacle of the living God. There is but one temple in the universe it has been beautifully said, and that is the body of man. Nothing is better than that high form. Bending before man is a reverence done to this revelation in the flesh. We touch heaven when we lay our hands on the human body."

In some other parts of the said lecture he has inculcated the doctrine of the incarnation of great men in general. In other places he has called prophets and religious instructors "God-men," and has attributed a divine nature to Chaitanya, Nanak and others. The expression of such opinions naturally would lead one to think that Keshub Chunder believed all great men or religious teachers to be incarnations of God and worthy of our homage. Proofs are not wanting to show that Keshub-worship was not confined to the person of Keshub himself. Other instances have been recorded in the *Brahma dharmer uchcha adarsa* as having occurred about the same time. Some results of the Keshub-worship movement are worth noticing. It led among Keshub's followers to a belief in the doctrine of Divine Injunction, as revealed through spiritual teachers, and entire trust and reliance on spiritual guides.

62. The *Brahmo Samaj of India* was opened on August 22, 1868.

On the 23rd January 1868, (Saka 11th Magh 1719), the day on which the 38th anniversary festival of the founding of the *Adi Samaj* was celebrated, the foundation-stone of the *Samaj* of India church was laid on a piece of ground at Jhamapukur in Calcutta. The money for the erection of this building was collected from among Keshub's followers. On this occasion the party walked in procession to the site from

---

* *Brahma Dharmer Uchcha Adarsa,* or High Ideal of Brahmoism by Rajnarain Bose.

† This prayer was published in the *Hindu Patriot.*

Keshub's house, singing and playing music all the way. The church was first formally opened for divine service on the 22nd day of the following month of August, when a Brahmotsava was performed with special solemnity. On this occasion twenty-one youths were initiated in the Brahmic faith.

63. Missionary work of the Brahmo Samaj of India.

We thus see after a series of years Keshub Chunder's efforts crowned with success. The foundation of the church of the *Samaj* of India led to much missionary enterprise. Protap Chunder Mozoomdar, Gour Gobind Roy, and Amritalal Bose were selected as proper instruments for the propagation of the Brahmic religion throughout India. The Deccan was selected as a proper field, and in consequence of some eloquent lectures delivered by Protap Chunder in the city of Madras, a *Samaj* was established in that city by such of its citizens as were impressed with the doctrines preached. Aghor Nath Gupta, another missionary, traversed with much difficulty the inaccessible forests of Assam, and preached with success among its crude and superstitious people.

Keshub Chunder had now even his fondest and most ambitious view to fulfil. His church, for which he had laboured and suffered so long, was now established upon a firm footing. His relations with the venerable and pious Devendranath Thakur and the *Adi Samaj* were of the most friendly kind; his disciples imbued with his own religious fervour were disseminating the Brahmic religion far and wide; and a splendid field of universal reform appeared open before him.

64. Keshub's visit to England—1870 A.D.

Under these favourable circumstances, like the great founder of the *Samaj*, he contemplated a visit to England, partly with a view of acquiring a better knowledge of European civilization and progress, but especially "to excite the interest of the English public in the political, social, and religious welfare of the men and women of India." A proclamation to this effect was put forth, and the approbation of the contemplated step by Keshub's followers was shown by the subscriptions raised among them to cover the expenses of the journey. Keshub Chunder accordingly set sail and safely reached England in the beginning of 1870, where he was enthusiastically received.

65. Its effect on Keshub.

It would be impossible to enter here into a detailed account of Keshub Chunder's visit to England. Suffice it however to say that it was a success, and that Keshub added greatly to his reputation for eloquence. He was received well by all parties, who were astonished to hear the many and important changes in the religion, manner, and customs of the Hindus which the *Samaj* had effected. From this intercourse with men of talent and enlarged views, Keshub greatly profited, and this was immediately apparent on his return to India.

66. *Indian Reform Association.*

Miss Collect says: "On Keshub's return to India he immediately began to put in practice some of the hints he had gathered in England, and started what he called the 'Indian Reform Association,' a body of which the nucleus was taken from his own church, but which was declared to be open to men of all classes, races, and creed, who would join to promote the social and moral reformation of the natives of India. This catholic design has happily succeeded in enlisting a wide amount of sympathy, and the Association contains Hindus, Mahomedans, Parsees, and Anglo-Saxons among its members, though of course the majority of them are enlightened Hindus. The Association is divided into five sections, *viz.*—(1) Female Improvement; (2) Education; (3) Cheap Literature; (4) Temperance; (5) Charity. In each of these departments good work has been done during the last few years. Space forbids any full epitome of details, but some mention must be made of the work undertaken by the first section, which

aims to meet the most difficult and important of all the needs of Indian society, the improvement of women.

67. The Female Normal and Adult School opened—February 1871 A.D.

The section commenced by opening a Female Normal and Adult School for the information of adult ladies who wished either to be instructed themselves, or to be trained for teaching others. This school was opened in February 1871, and in the following year a girls' school was attached to it. The attainments of the ladies have been tested by monthly and yearly examinations; those in vernacular studies by high class Hindu teachers and Government Inspectors; those in English by experienced English governesses resident in India, and the results have been highly satisfactory, so much so that the school after eight months' exsistence obtained the privilege of a grant-in-aid from the Bengal Government, which in its turn has enabled the manager to improve the education given. The pupils of the Female Normal School have also shown activity by establishing a little society among themselves for their own improvement, which meets every Friday afternoon, under the presidency of Keshub Chunder Sen, when papers are read and discussions held on questions interesting to the female intelligence of of India. An excellent Bengali journal, the *Bamabodhini Patrika*, devoted to the interests of women, started in 1864, has since August 1871 been placed under the management of the Female Improvement Section of the Association.* It is read by hundreds of native women, and many of them contribute to its pages, both in prose and verse. The Indian Reform Association held its first public anniversary in April 1872, an occasion which happily illustrated the catholic nature of the society. The Bishop of Calcutta, Dr. Milman, moved the first resolution; he was followed by the head of the Scottish Dissenters in India, Dr. Murray Mitchel, an energetic Native Christian clergyman, two Hindu gentlemen of high standing, and two Brahmas, *viz.* P. C. Mozoomdar, and Keshub Chunder Sen. The latter, as President of the Association, closing the meeting with a short speech.

68. Devendranath assists in the erection of the Brahmo Samaj of India.

It will thus be seen that Keshub Chunder was not idle in taking measures for the improvement of his countrymen. Keshub chunder had now been separated for seven years from *Adi Samaj*, and the *Samaj* of India church had just been built and consecrated, when Devendranath Thakur, the chief of the *Adi Samaj* returned from a sojourn in the Himalayas. Devendranath had always accorded his support and countenance to Keshub, and hailed the establishment of a second Mandir as indicative of Brahma vitality and the spread of the religion. What he had protested and used his authority against was Keshub Chunder's attempt to overthrow his power in the *Samaj* on the pretence of introducing radical and progressive reforms, which Devendra full well knew could not be made in a day. This misunderstanding was however soon forgotten, and Devendra generously assisted Keshub in the erection of a new church, through many of Keshub's religious views were opposed to his own.

69. The proposal of re-uniting the two Samajes.

After his return from the Himalayas the two chief ministers often met, and often worshipped in each other's respective churches. While thus cordially associating with and assisting one another, the question of reuniting the two churches was discussed, and it was proposed that a written agreement should be signed by both, in which they were to pledge themselves to co-operate in the cause of Brahmic propagandism. A draft of the proposed agreement was drawn up by Keshub Chunder, and sent to Devendranath Thakur. Tho terms of the ageeement drawn up by Keshub Chunder were as follows :—

* It has lately been withdrawn from the said management.

"As the division which has taken place of late years between the Brahmas is found, though productive of some good to the general cause, to have created a sad apathy to the true spirit of religion among them, it is deemed necessary to adopt a measure which may tend to obviate this growing evil, and establish a fellow feeling between them. The distinct characters of the religious principle and modes of social reform of the old and new churches are well known to all, from the fact of their acting independently of each other for so long a time. Now, should both parties, being acquainted with this, have the magnanimity, in disregard of minor points of difference, to co-operate with each other in bringing about these ends, they will no doubt, it is believed, prove of great service to the church. It is for this end that we make this treaty between ourselves, and solicit every Brahma in India to join us in this purpose. Hereby a compromise is made of the differences of opinions hitherto existing in the opinions of the two parties, as follows :—

1st.—The Brahmas must worship no other being but God, nor place their belief in any man as the only means of their salvation.

2ndly.—The vitality of Brahmaism is to be considered as solely consisting in our immediate communion with God, and in the conviction that the mediation of any person is entirely opposed to it.

3rdly.—Worship of the only one God forms the principal article of Brahmic faith, and the chief ground of their mutual agreement. Let this worship, therefore, continue to remain as the main bond of the Brahmic paternity in all places.

4thly.—Social reform must not be so binding on a Brahma as his forsaking of idolatry and all kinds of sins.

5thly.—The *Adi Samaj* is employed in the propagation of the Brahmic religion, conforming, however, in their social customs, as far as practicable according to the dictates of conscience, to those of orthodox Hindus, while the *Samaj* of India has been attempting to disseminate the principles of Brahmaism among all nations, and to conduct all social rites according to strict Brahmic institutes. Both parties now join themselves in one common religious cause, but reserve to themselves respective independence in all such matters."

সাধনায় সিদ্ধি।

(শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ)

মানুষ মাত্রেই ভগবানের অংশ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শ্রীভগবান নিত্য বিদ্যমান। সকল মানুষের মধ্যেই এমন একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহা দ্বারা জগতে এমন কোন কাজ নাই, যাহা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু সেই যে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার বিপুল শক্তি, যাহা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় থেকে ক্রমে ক্রমে লুপ্তপ্রায় হ'তে চ'লেছে, সর্ব্বপ্রথমে চাই আমাদের সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তার পরিচর্য্যা করা ও ক্রমে ক্রমে তার উৎকর্ষসাধনে সচেষ্ট হওয়া। এর জন্য আমাদের কি করতে হবে? এর জন্য 'সাধনা' চাই—একমাত্র সাধনার দ্বারাই আমরা সেই লুপ্ত শক্তির উদ্ধার করতে পারি। সেই শক্তিকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তার উন্নতিকল্পে তার সেবায় ধীরে ধীরে আত্মমন নিয়োজিত করতে পারি, তাহলে কালে সেই শক্তি আমাদের দেহে মনে এমনি প্রভাব এনে দেবে যে, আমরা সম্মুখের শতবাধাকে অতিক্রম ক'রে সকল কাজে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হব।

আজ যে আমরা দুর্ব্বল, পঙ্গু, শীর্ণ হয়ে পড়েছি—কিসের জন্য? শুধু শক্তির অপচয় ঘটিয়ে মনের মধ্যে আমরা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিয়ে তার শুশ্রূষা করে দিন দিন তাকে এমনি সতেজ করে তুলেছি যে, সে এখন আমাদের নিয়ে একটা বীভৎস কৌতুকের খেলা সুরু করে দিয়েছে। প্রতিমুহূর্ত্তে সে আমাদের কণ্ঠরোধ করছে, আমাদের নিশ্বাস বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে ; আর যেমনি আমরা আর্ত্তস্বরে কাতর ক্রন্দন করে উঠছি একটু বাঁচবার জন্য, অমনি সে তার হাত সরিয়ে নিয়ে বিকট অট্টহাসি হেসে সরে দাঁড়াচ্ছে। একেবারে সে মারছে না, কিন্তু পলে পলে তিলে তিলে সে টেনে নিয়ে চলেছে আমাদের মরণের পথে খেয়ালের খেলায় মেতে। এই খেলাই সে খেলতে সুরু করে দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, আর খেলে চলবেও সারাজীবন তার এই পৈশাচিক খেলা।

আমাদের সকলের এখন প্রধান ও প্রথম কাজ, মনের সেই সর্ব্বনাশা দুর্ব্বলতাকে হত্যা করে তার আসনে সবলতার প্রতিষ্ঠা করা, তার পূজো করা ও তার উৎকর্ষসাধনে ব্রতী হওয়া। এর মূলে আমাদের দরকার ইচ্ছা, একাগ্রতা ও সংযম। দুর্ব্বলতাপ্রসূত মনের যে গ্লানি, তাকে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়ে শুধু সবল সুন্দর জীবনগ্রহণে প্রবৃত্ত হতে হবে; শক্তির উপাসক হয়ে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে; তাহলেই আমরা যে কোন কাজই হোক্ না কেন, হোক্ সে দেশের, হোক জগতের, হোক্ সে সারা ব্রহ্মাণ্ডের, আমরা নির্ভয়ে নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হয়ে যেতে পারবো এবং সাফল্যের বিজয়তিলকে ললাট অঙ্কিত করতে পারবো।

জাতির কল্যাণ ও উন্নতির মূলে জাতির ঐকান্তিক ইচ্ছাই প্রধান সহায়। এই ইচ্ছাকে বলবতী করে তুলতে পারলে তার পাওয়ার পথে বিঘ্ন কিছুই থাকে না। ঐকান্তিক ইচ্ছাই মানুষকে সকল কর্ম্মে সফলতা প্রদান করতে সক্ষম হয়। পাওয়ার আশাকে ফলবতী করতে হলে পাওয়ার ইচ্ছাকে বলবতী করতে হবে। দৃঢ়তার ভিত্তিতে তাকে এমনিভাবে স্থাপিত করতে হবে, যে শত ঝঞ্ঝাতেও সে কাঁপবে না, শত আঘাতেও টলবে না, শত প্রলোভনের ভারেও সে নুইবে না—হিমাদ্রিসম অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকবে।

এই যে ইচ্ছা, মানুষ একমাত্র যার দ্বারা সকল কাজে সফলতা আনয়ন করতে পারে, সেই ইচ্ছাকে দৃঢ়, সফল ও সবল করে তোলবার প্রথম ও প্রধান উপায়—আত্মশক্তি সঞ্চয় করা, তার উন্নতিকল্পে ব্রতী হওয়া। এ করতে হলে গোড়াতেই বলেছি দরকার আমাদের সাধনা। জগতে সাধনা ব্যতীত কোন কাজই সুসিদ্ধ হয় না। আমরা যদি প্রত্যেকে আত্মশক্তি সঞ্চয়ের জন্য সাধনায় লিপ্ত হই, তাহলে আজ যে কাজ আমাদের কাছে জটিল অসম্ভব বলে ঠেকছে, তাই একদিন এমনি সহজ ও সরল হ'য়ে উঠবে যে, আমরা অনায়াসেই তা সম্পাদন করতে সক্ষম হব। পরের কিছু নিয়ে কেহ কখন বড় হয় না, হ'তে পারে না—নিজস্ব কিছু থাকা চাই; ধার করা জিনিষ নিয়ে বা ফাঁকি দিয়ে যেমন কেহ কখন বড় হতে পারে না, বহির্দৃষ্টিতে বড় বলে মনে হ'লেও সে যেমন চিরকালই ছোট থেকে যায়, তেমনি পরের শক্তি নিয়েও জয়ী হওয়া চলে না। জয়ী হতে হলে চাই আত্মশক্তি, নিজস্ব ধন। পরের আজ্ঞার অপেক্ষা সে রাখে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে সে বসে থাকে না; কর্ত্তব্যের ডাকে সে একলাই বেরিয়ে পড়তে পারে; তুচ্ছ বিপদের ভয় তাকে ঘরে আটক রাখতে পারে না, চোখ রাঙিয়ে দাবিয়ে রাখতে পারে না তাকে ধার করা শক্তির ছদ্ম প্রভাব। আজ থেকে যদি আমরা মনের দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও সংযমের সহিত আত্মশক্তি সঞ্চয়ের সাধনায় মন নিবিষ্ট করি, তাহলে দেশের কাজ, দশের কাজ ও জগতের কল্যাণসাধনের পক্ষে আর আমাদের কোন বাধাই থাকবে না। আমরা সকল বাধাকে অতিক্রম করে আমাদের চাওয়াকে পাওয়ার দ্বারা পূর্ণ করে নিতে পারব।

কৃষ্ণনগর-ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

যে পরম মঙ্গলময়ের শুভেচ্ছায় আমাদের শতাধিক দ্বিতীয় মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইল, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই উদ্দেশে আমাদের সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত দুই বৎসর উপযুক্ত উদ্যোক্তার অভাবে কৃষ্ণনগরে মাঘোৎব সম্পন্ন করা যায় নাই। ভগবানের কৃপায় এইবার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেন ও সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দিগকে আমাদের মধ্যে পাইয়া মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে মনস্থ করি। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণও যথেষ্ট উৎসাহ দেন ও আনুকুল্য করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিম্নলিখিত প্রণালীতে শতাধিক দ্বিতীয় মাঘোৎসব কৃষ্ণনগরে সুসম্পন্ন হয়।

১০ই মাঘ রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং উপাসনান্তে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "প্রার্থনা" ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন এবং উপদেশ দেন।

১১ই মাঘ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপাসনা করেন এবং উপাসনান্তে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন ও উপদেশ দেন। অপরাহ্ণে মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। স্থানীয় হরিসভার কতিপয় সভ্য খোলকরতালাদি সহ কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া কীর্ত্তনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন; উপাসনায় এবং কীর্ত্তনে আশাতিরিক্ত লোকসমাগম হইয়াছিল। ইঁহাদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১২ই মাঘ মঙ্গলবার, স্থানীয় কলেজ-হলে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সম্মেলন সভা আহূত হইয়াছিল। জ্ঞানবৃদ্ধ,

বর্ষীয়ান্, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রায় শ্রীদীননাথ সান্যাল বাহাদুর কৃপা করিয়া উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ ও ধন্য করিয়াছেন। সভারম্ভে সাহিত্যিক সভাপতির সুসংযত লেখনী-প্রসূত ধর্ম্মের মর্ম্মকথাপূর্ণ একটি উদ্বোধনী পঠিত হইলে * কৃষ্ণনগরের জেলা জজ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মোদক আই, সি, এস, মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় "মানবসেবাই ঈশ্বরসেবার প্রতীক" সর্ব্বধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠ বাণীর পোষকতায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের বাণী, খৃষ্টধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, হিন্দুধর্ম্মের অনন্যসাধারণ প্রগতিসূচক প্রবন্ধাবলী নিম্নোক্ত ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে পঠিত হয়—

১। খাঁ বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক্

২। Mr. B. W. Bean

৩। Rev. T. N. Biswas

৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জ্জি

৫। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত

৬। " বিনায়ক সান্যাল

৭। " অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

৮। " বেচারাম লাহিড়ী

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে কিছু বলেন।

ঐশী সাধনার মূল কথা, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সমাচার, সর্ব্বজীবের কাম্য সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনসম্পদরাজি বিভিন্ন ধর্ম্মসাধনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন মার্গাবলম্বনে পরিস্থিতি লাভ করিলেও সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্ব্য গতি যে একই, তাহা সকল প্রবন্ধলেখক ও বক্তৃমণ্ডলী তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়া অতি সৌষ্ঠবের সহিত প্রতিপন্ন করায় আমাদের সম্মেলনও অতীব সৌষ্ঠবযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে সার্দ্ধ তিন ঘটিকাব্যাপী সুদীর্ঘ ধর্ম্মালোচনার পর সভাপতি মহাশয়ের শেষোক্তি ও রীত্যনুসারে ধন্যবাদদানের পর অধিক রাত্রে সভাভঙ্গ হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে আমাদের কর্ত্তব্য, যে সকল ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ এই সুষ্ঠু অনুষ্ঠানে আমাদিগের সহায়তা করিয়া অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বশম্বদ

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস।

সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজ কৃষ্ণনগর।

---

* গত সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। তং সং

মেদিনীপুর-ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

আমরা গত ২২শে ফেব্রুয়ারীর মেদিনীপুর হিতৈষী পত্রে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের ৮৬তম উৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় ৺শিবচন্দ্র দেব ও ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিন শ্রীযুক্তা সারদা মঞ্জরী দত্ত উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্তা নলিনী দিন্দা বি-এ প্রভৃতি মহিলাগণ মনোগ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাস এম-এ, বি-এল, কীর্ত্তনাদির দ্বারা উপাসকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং রমেশবাবু "ব্রাহ্মসমাজে পাপীর নবজীবনলাভ" বিষয়ে কথকতা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও জেলাবোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়ের যত্নে ও উদ্যমে উৎসবটী সুসম্পন্ন হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

নানাকথা।

রাজেন্দ্রমল্লিক হাঁসপাতাল—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের স্মৃতিকল্পে তাঁহার জন্মভূমি সিঙ্গুড় গ্রামে একটী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত হাঁসপাতালে পুরুষ ও স্ত্রীলোক রোগী এবং সংক্রামক রোগী সকলের পৃথক পৃথক থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাননীয়া লেডী জ্যাক্সন উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এরূপ পূর্ণাবয়ব হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা বোধ হয় এই প্রথম। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং সেই শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে মল্লিক মহাশয় এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত সিঙ্গুর গ্রামের শত শত অধিবাসীগণের বংশানুক্রমে কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী— আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম, ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মুদ্রা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণার

জন্য ভারতীয় মুদ্রাবিজ্ঞানসমিতি হইতে Nelson Weight পদক লাভ করিয়াছেন। চিন্তা করিলে বড়ই আনন্দ হয় যে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে এদেশবাসী গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা নবতর সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়া জগতের মহাসভায় স্বীয় আসন সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা জগতকে নবতর সত্য-সকল দান করিতেছেন কেবল তাঁহারাই যে ইহা দ্বারা উপকৃত হন তাহা নহে; কিন্তু ইহার ফলে এদেশবাসী জনসাধারণের মস্তক হইতে পরাধীনতা ও দাসমনো-ভাবের বোঝা অনেক পরিমাণে নামিয়া যায়। মার্‌ম্যান প্রভৃতি তথাকথিত বিদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের ইতিহাস পড়িয়া আমরা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া আপনাদিগকে হেয় বোধ করিতাম ও দাসমনোভাবের খতে স্বাক্ষর করিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু তেজস্বী ৺অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় স্বাধীন গবেষণা দ্বারা সেই সকল মিথ্যা ঐতিহাসিকতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া আমাদিগকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ও স্বাধীনতার মঙ্গলবায়ু গ্রহণ করিবার অবসর প্রদান করিলেন। সেই প্রকার বিজ্ঞান-বিভাগে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, সার সি. ভি. রমন্ প্রভৃতি; দর্শনবিভাগে সার রাধাকৃষ্ণন্, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি; সাহিত্যবিভাগে ৺বঙ্কিমচন্দ্র, পূজ্যপাদ রবীন্দ্র-নাথ প্রভৃতি স্বাধীনতার নবতর পথসমূহ উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে অল্পকালের মধ্যে যে কিরূপ মুক্তি দান করিয়াছেন, তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুরেন্দ্রবাবু মুদ্রাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে নবতর সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের দাসমনো-ভাবের আর একটী সূত্র কাটিয়া গেল। এই কারণে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি।

রামমোহন রায় স্মৃতিমন্দির— আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মহারাজা সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সভাপতিত্বে তাঁহার প্রাসাদে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে স্মৃতিমন্দির সম্বন্ধীয় সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত কয়েকজন সভ্যের মুখে শুনিলাম যে, মহারাজা বাহাদুর উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরে যে একটী উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হইতে পারিয়াছে, ইহার জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় বিশেষ প্রশংসা পাইবার যোগ্য এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা-লাভের অধিকারী। তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা না হইলে এই প্রতিষ্ঠানটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত কি না সন্দেহ। তথায় একটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য দ্বিজেন্দ্রবাবুর পত্নী ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ।

(আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত)

ওঁ

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু— বেজুড়া

মহাত্মন্! ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। প্রচারব্রত উত্তমরূপ চলিতেছে। সভ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ক্ষিতীন্দ্রসেবাশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছে। কতিপয় সুশিক্ষিত যুবক একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ নামকরণ করিয়া একটী নূতন সমাজ গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা জন্মগত জাতিভেদপ্রথা, অবতার-বাদ, গুরুবাদ, পুরোহিতবাদ মান্য করেন না। গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ বর্ণভেদপ্রথা মান্য করেন। তাঁহারা বলেন, "জড় পদার্থের প্রতি আসক্তি, ধাতু-কাষ্ঠ-মৃত্তিকা-প্রস্তরনির্ম্মিত দেবদেবী প্রভৃতির পূজা পরিহারপূর্ব্বক আমরণ পরমেশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রাখিয়া তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই প্রত্যেক মানবের পরম ধর্ম্ম।

শ্রীহট্টমাতার সুসন্তান ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয়ের শ্বশুরালয় বেজুড়াগ্রামে। তাঁহার শ্বশুরের নাম স্বর্গীয় হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বেজুড়ার এই ভট্টাচার্য্য-বংশ সিদ্ধ মহাপুরুষ রমাকান্ত বিশারদ মহাশয়ের সন্তান। মুসলমান-শাসকেরা বিশারদ মহাশয়ের অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিপুল ভূসম্পত্তি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া রঘুনন্দন-পর্ব্বতস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া যোগসাধন করিয়াছিলেন। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগে তিনি পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয় সন্তদাস নাম ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধামে মহান্ত হইয়াছেন। এই মহান্তমহারাজ তাঁহার শ্যালক শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মুসলমান ও খ্রীষ্টান সন্তান যদি হিন্দু আচার গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুসমাজের সভ্য হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে

তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য"? ইহার উত্তরে মহান্ত মহারাজ বলিলেন—"কর্ত্তব্য"। ইতি

প্রণতঃ
প্রসন্ন
(শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার শাস্ত্রী)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আদিব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার হিতৈষী বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, তত্ত্ববোধিনী উননব্বই বৎসর অতিক্রম করিয়া ভগবানের কৃপায় আগামী ১লা বৈশাখে নবতিতম বৎসরে পদার্পণ করিবে। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই পত্রিকা একনিষ্ঠভাবে সত্য-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, সুনীতি, বিজ্ঞান ও সৎসাহিত্য প্রচারের দ্বারা বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া আসিতেছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে, এই পত্রিকা উহার প্রবন্ধাদি গুণে শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদরলাভ করিতেছে। আমরা নিম্নে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

(১) গত মাঘোৎসব উপলক্ষে বন্ধুবর ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব সংক্রান্ত একটি আখ্যায়িকা লইয়া যে "ভক্তলীলা" বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই ভাল লাগিয়াছে। গত ১৭ই চৈত্র তারিখের শিক্ষাসমাচারে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) গত ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণীদেবী লিখিত "সংসারে ব্রহ্মসাধন" বিষয়ক উপদেশটী সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। অন্যতর সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র জন্মভূমির গত কার্ত্তিক-সংখ্যায় উপদেশটী উদ্ধৃত করিয়া সাধারণে প্রচারিত হইবার সুবিধা করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সংসারে ব্রহ্মসাধন ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা। এই সত্য দেশে বহুল প্রচারিত হইলে উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

(৩) খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অন্যতর মুখপত্র "প্রচার"পত্রের সম্পাদক রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহা আমাদিগকে লিখিয়াছেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

Your তত্ত্ববোধিনী keeps my memory always fresh about you. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা is an excellent paper, rather the excellent paper ever published in Bengal. The contents of each number of it are pure, holy and inspring and they draw the ধর্ম্মপিপাসু into the presence of the Most Holy. Your prayers which come out of the depth of you heart are simply inspring, when I read them I feel absorbed in the spirit of the loving father. I am very thankful to you for your heart-searching thoughts and elevating doctrines.

(৪) গত অগ্রহায়ণের শিক্ষাসমাচার বলেন—সাহিত্যমণ্ডলে ধর্ম্মনীতিমূলক পত্রিকা বড় নাই। প্রকৃত পক্ষেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি সংখ্যা আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে পূর্ণ থাকে। এই দেশে ধর্ম্মমূলক পত্রিকার যে আদর আছে, তাহা তত্ত্ববোধিনীর কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ সহস্র সংখ্যা-প্রকাশে প্রমাণ হইতেছে। এই পত্রিকায় কিরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা ডাঃ শ্রীবাণীদেবী সঙ্গীতভারতীর "ভারতীয় সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক ভাব" প্রবন্ধপাঠেই পাঠকবর্গ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সংবাদ।

বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা—আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আর্য্যসমাজের অন্যতম প্রচারক সুপণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজে বেদীগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি সরল ও সুবোধ্য হিন্দীভাষায় সুললিত-ভাবে ব্রহ্মোপাসনার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে আর্য্যসমাজের প্রচারকের দ্বারা নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থার ইচ্ছা আছে, যাহাতে উভয় সমাজ যথাসম্ভব মিলনের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

দানপ্রাপ্তি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পরলোকগত ডাক্তার বনোয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তদীয় বিধবা-পত্নী শ্রীপ্রমদা চৌধুরাণী মহাশয়া আদিব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।